বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য : সৃষ্টি ও শৈলী

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি উপাধির জন্য উপস্থাপিত গবেষণাপত্র

গবেষক

চিরঞ্জীব মুখার্জী

তত্ত্বাবধায়ক

ড. উৎপল মণ্ডল

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

নভেম্বর ২০১৪

প্রারম্ভিক স্বীকারোক্তি

এতদ্বারা, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী, এই মর্মে জানাচ্ছি যে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে, পিএইচ.ডি উপাধির জন্য অধ্যাপক ড. উৎপল মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে **"বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য : সৃষ্টি ও শৈলী"** শীর্ষক যে অভিসন্দর্ভটি বিচার ও পরীক্ষণের জন্য পরিবেশনে প্রস্তুত, তার কোনো অংশ পূর্ববর্তী কোনো গবেষণা প্রকল্পে ব্যবহৃত হয় নি।

তারিখ-

নমস্কারান্তে

বিনীত

চিরঞ্জীব মুখার্জী

(চিরঞ্জীব মুখার্জী)

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
দার্জিলিং ৭৩৪ ০১৩ | পশ্চিমবঙ্গ | ফোন ০৩৫৩-২৫৮০১৮৯

রেফারেন্স নম্বর .....

তারিখ ২৪.১১.২০১৪

অনুমতি পত্র

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের গবেষক চিরঞ্জীব মুখার্জী আমার তত্ত্বাবধানে গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করেছেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম "**বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য : সৃষ্টি ও শৈলী**" (Registration No 020010 of 2011-2012)।

এই গবেষণাপত্র উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিষয়ক আইন অনুযায়ীকৃত।

গবেষণাপত্রটি ইতিপূর্বে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি বা এম.ফিল ডিগ্রির জন্য দাখিল করা হয়নি।

চিরঞ্জীব মুখার্জীকে তাঁর গবেষণাপত্র জমা দেবার অনুমতি দেওয়া হলো।

ড. উৎপল মণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক এবং গবেষণা পরিচালক
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

নিবেদন

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রথমশ্রেণীর স্রষ্টা বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি সমাজে বাঙালি পাঠকের কাছে প্রায় উপেক্ষিত বলে দুঃখ হয়। তার কারণ কোন বাঙালি প্রাবন্ধিক তাঁর মত সংক্ষিপ্ত জীবনকালে (যার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় ইংরেজ কবি কীটস্ এর সংক্ষিপ্ততম জীবনকাল) প্রবন্ধের কঠিন শিল্পশৈলীতে কালজয়ী সাফল্য দেখাতে পারেননি। কাজেই গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়ার সময় আমার প্রিয় তত্ত্বাবধায়ক ড. উৎপল মণ্ডল মহাশয় যখন আমাকে গবেষণার বিষয় হিসাবে "**বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য: সৃষ্টি ও শৈলী**" শিরোনামটি নির্দিষ্ট করে দেন এবং তার সহায়ক হিসাবে কয়েকটি গ্রন্থের পঠনের নির্দেশ দেন তখন এমন একটি প্রায় অনালোচিত ব্যক্তিত্বের উপরে কাজ করার তীব্র আকর্ষণ আমার মনে দানা বাঁধে। অন্যদিকে এমন একটি প্রায় অনালোচিত ব্যক্তিত্বের উপরে তেমন বিস্তৃত কাজ না হওয়ায় মনে মনে একটা আশঙ্কায় ভুগছিলাম। আর এই মহা আশঙ্কা থেকে উদ্ধার করে আনলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. উৎপল মণ্ডল মহাশয়; তাঁর অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও সহযোগিতা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করছি। প্রশ্রয় পেয়েছি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের কাছ থেকেও।

উত্তরবঙ্গের গ্রন্থাগার, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী, কৃষ্ণনগর দ্বিজেন্দ্র পাঠাগার প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ যেভাবে আমার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

যাঁদের ঐকান্তিক সাহচর্য ছাড়া এই অভিসন্দর্ভটির রূপায়ণ সম্ভব ছিল না তাঁরা আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, আমার আশ্রয় পরিবার-পরিজন, মা-বাবা। আর একজনের কথা উল্লেখ না করলে সত্যের অপলাপ ঘটবে— আমার সর্বক্ষণের সাথী চন্দ্রাণী মুখার্জী। তাঁর শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমার গবেষণার প্রতি দায়বদ্ধতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। অনেক চেষ্টা

করেও বেশ কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে গেছে।

পরিশেষে, এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি যাদের সাহায্যে পরিপূর্ণতা পেল সেইসব নাম না জানা মুদ্রণ কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কাজটিকে গ্রহণযোগ্যরূপে উপস্থাপনা, বিশেষত অক্ষর বিন্যাসের ব্যাপারটিকে সুসম্পন্ন করার জন্য অর্ণবদা এবং গবেষণাপত্রটি লেখার কাজে উত্তম, শ্রাবণী, অঙ্কিতা, পপি, কামরুল, অরূপ এদের সকলের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। এছাড়াও রইল আরো অনেকে যাঁদের সাহচর্য আমাকে সমৃদ্ধ করেছে সর্ব অর্থে, কৃতজ্ঞ রইলাম সবার কাছে।

তারিখ :

(চিরঞ্জীব মুখার্জী)

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র সন্তান বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা হয়েও বাঙালী পাঠক সমাজের কাছে উপেক্ষিত। স্বল্পায়ু জীবনে বলেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে অপ্রতুল দিলেও উৎকর্ষতা ও বৈচিত্র্যে তা অনন্য— 'উত্তর চরিত', 'মেঘদূত', প্রাচীন ভারতীয় কাব্য সম্পর্কে আলোচনা, 'কণারক', 'শুভ উৎসব', প্রাচীন ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি, চিত্র-ভাস্কর্য সম্পর্কিত আলোচনা আবার কোথাও নিছক চিত্র সৃষ্টির নেশায় তিনি মত্ত। বিষয়বস্তু গ্রহণের পাশাপাশি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আনুগত্য, প্রগাঢ় সৌন্দর্যবোধ, বিদেশী শিক্ষা মোহমুক্ত স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বলেন্দ্রনাথের দুর্লভ গুণাবলীর পরিচায়ক। বলেন্দ্র লেখনী ভাবে, ভাষায় নতুন। এ ভাষা বুদ্ধি, যুক্তি, তথ্যবিন্যাস কিংবা তত্ত্বব্যাখ্যার ভাষা নয় বরং অনুভূতি প্রকাশের ভাষা- যেখানে ভাষার সূক্ষ্ম কারুকার্য আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশিত। প্রসঙ্গের সঙ্গে প্রযুক্তির সমতা বলেন্দ্র কৃতিত্বের পরিচায়ক। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান নির্ণয়ই আমার গবেষণার মূল লক্ষ্য।

প্রথম অধ্যায়ে বলেন্দ্র জীবনীর কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সূত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি যে তাঁর ব্যক্তি চিন্তা, ব্যক্তি জীবনে তাঁর সৌন্দর্যবোধ, পারিবারিক ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তিনির্ভর মতামত, বিশ্বাসবোধ, সংস্কৃতের প্রতি আগ্রহ, প্রপিতামহের ব্যবসা-বাণিজ্যের বহুমুখী উদ্যম, দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা, পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যব্রতর দ্বারা তিনি কিভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্র অনুসারী হয়েও একান্ত অনুকারী নন। বলেন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে তৎপরতা ছিল রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের নান্দীমুখ। শান্তিনিকেতনে শিক্ষার দীপশিখাটি প্রথম জ্বালাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন বলেন্দ্রনাথই। বলেন্দ্রনাথের ধর্মসমন্বয় প্রচেষ্টা কতটা আন্তরিক ছিল তা ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের সমন্বয়ের মধ্যে একটি নিখিল ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায় গঠনের প্রচেষ্টাতেই প্রমাণিত। উনিশ শতকে ভারতবর্ষের ধর্ম আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আর এই দুই সমাজের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে বলেন্দ্রনাথ যে কতটা উদারতা দেখিয়েছিলেন তা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ আলোচিত হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ ও রবীন্দ্র সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠার জন্য বলেন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী। আত্মগত ভাবনা কামনার পক্ষ নির্ভর করে তিনি রোমান্টিকতার আকাশে ডানা মেলে দিয়েছিলেন। সৌন্দর্য দর্শন ও সমালোচনার সৃষ্টিকার্য উভয় সত্তার প্রকাশই আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের নিজস্বতা। বাল্যকালে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা হয়তো বা তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের অন্যতম কারণ হলেও তাঁর বিশ্লেষণভঙ্গি ও রসিকতা ঠাকুরবাড়ির পরিবেশেই দেশী-বিদেশী সাহিত্যচর্চায় পুষ্ট। স্বভাবতই এই দু'য়ের প্রভাবে তাঁর রচনায় এসেছে তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার ভঙ্গি। তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র পথিকৃৎ হলেও বলেন্দ্রনাথের স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গিটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলেন্দ্র লেখনীতে বিবিধ ধারায় তুলনামূলক সমালোচনা ধারা প্রবাহিত। যদিও সংস্কৃত সাহিত্যের কবি কালিদাসের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরক্ত। তবুও কখনো কালিদাস-বাল্মীকি, কালিদাস-ভবভূতি, কালিদাস-শূদ্রক, কিংবা জয়দেব বনাম বৈষ্ণব কবির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, ঠিক তেমনি কখনো বেছে নিয়েছেন দু'টি কাব্যের তুলনাকে, যেমন- 'মেঘদূত' বনাম 'ঋতুসংহার' কখনো বা সংস্কৃত সাহিত্য প্রকৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রকৃতির তুলনা চলেছে। তুলনার ক্ষেত্র হিসাবে কাব্যের চরিত্রও বাদ যায়নি- উদয়ন বনাম দুষ্মন্ত বা রামচন্দ্র তাঁর আলোচনায় স্থান করে নিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই আলোচনায় বাংলা সাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনা সাহিত্যের জনক বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা আলোচিত। রবীন্দ্র লেখনীর সঙ্গে বলেন্দ্র লেখনীর (মেঘদূত কেন্দ্রিক) তুলনামূলক আলোচনাও এই অধ্যায়ে ধরা পড়েছে। প্রসঙ্গত বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য হয়েও ভারতীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য সন্ধানে তিনি রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী—এ সত্যখানি এখানে সুস্পষ্ট। এককথায় সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করলেও সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপকরণে তাকে সুদৃঢ় করে তোলাই বলেন্দ্র লেখনীর বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি, চিত্র-ভাস্কর্য বিষয়ক প্রবন্ধ। সৌন্দর্য পিয়াসী বলেন্দ্রনাথের ইতিহাসের তথ্যস্তূপের ভিতরে জাতির প্রাণস্পন্দন, প্রেম ও সৌন্দর্যের

যুগ্মবিহার। গৌরবান্বিত অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাস, অতীতচারিতার মধ্যে যে রোমান্টিক বেদনাবোধ, মন্দিরময় ভারতে যে সাংস্কৃতিক শক্তি তাঁর ক্ষণকালীন জীবনে চিরকালীন মন্ত্রশক্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। পাঞ্জাবের সাথে বাগ্‌দাদের স্থানিক দূরত্ব বলেন্দ্রনাথের লেখায় হারিয়ে যায়। ইসলামী গম্বুজ মিনার আর হিন্দু দেবদেবীর চিত্র একাকার হয়ে যায়।

বাংলা সাহিত্য চর্চাতে বলেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার অন্বেষণের প্রচেষ্টা চলেছে **পঞ্চম অধ্যায়ে**। সংস্কৃত সাহিত্য শুধু নয়, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর সম্যক প্রতিভার পরিচয় মেলে 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস', 'রামপ্রসাদের গান', 'কৃত্তিবাস', 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' প্রভৃতি প্রবন্ধে। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতেও তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় মেলে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে রম্যরচনা শাখাটিতেও বলেন্দ্রনাথ যে ফুল ফুটিয়েছেন তা আলোচিত হয়েছে। রম্যরচনাগুলিতে তাঁর বেদনার আভা ফুটে উঠেছে। উন্মাদ পিতার পুত্র হিসাবে ঠাকুরবাড়ির বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যেও বলেন্দ্রনাথ ছিলেন নিঃসঙ্গ, স্বভাবতই তাঁর অন্তরও ছিল বিষণ্ণ ও ব্যথিত। আর এই কারণেই তাঁর রচনাতেও এসেছে বিষণ্ণতা।

সপ্তম অধ্যায়ে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধশৈলীর নানাদিক উঠে এসেছে। তাঁর রচনার ভাব যেমন নতুন তেমনি ভাষাও নতুন। তাঁর ভাষা অনুভূতি প্রকাশের ভাষা। ভাষারীতির ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করেছিলেন। তিনি বাক্যসজ্জা, শব্দ চয়ন, কিংবা অলংকার প্রয়োগে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাসবদ্ধ শব্দের পাশাপাশি দেশী শব্দের নিরন্তর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। 'এবং' দিয়ে বাক্য শুরুর রীতি, যতি-চিহ্নাদির ব্যবহার, ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ, ইংরেজি শব্দের সঙ্গে বাংলা শব্দের সমাসবদ্ধ রূপের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে এই অধ্যায়ে।

উপসংহার

বলেন্দ্র প্রতিভা ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি প্রবন্ধের কঠিন শিল্পশৈলীতে কালজয়ী সাফল্য দেখিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা ছিল অসমাপ্ত, পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই তা অস্তমিত হয়েছে। তবুও বলেন্দ্রনাথকে অ-রচিত বাংলা স্টাইলিস্ট গদ্যের মহানায়ক বলতে দ্বিধা

নেই। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একলব্য শিষ্য, সাহিত্য চর্চার সঙ্গী, জমিদারী পরিভ্রমনের সহযাত্রী এবং শিলাইদহ জীবনে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অনুজ পরিকর হলেও একান্ত অনুকারী নন। তাঁর রচনায় নিজস্ব শৈলীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা কখনোই বশীভূত নয়। তাঁর রচনায় বহুলতা না থাকলেও বৈচিত্র্য ছিল। ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন এবং বিপরীতমুখী প্রবণতা তাঁর সাহিত্যকর্মের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ক্ষণকালীন জীবনে প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন বলেন্দ্রনাথ, সঙ্গে যোগ হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আর তাতেই বিস্ফোরণ ঘটে গেছে তাঁর সৃষ্টিতে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান নির্ণয়ই তাই আমার মূল লক্ষ্য।

কথামুখ

'প্রবন্ধ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন। এই সূত্রে বলা যায়, কোনো সাহিত্যিক যখন কোনো মননশীল গদ্যরচনা বিষয়বস্তুর প্রাধান্য বা বিষয় নিষ্ঠায় তত্ত্ব ও তথ্যের সুনিপুণ সমাবেশে যুক্তির বন্ধনে এবং রচয়িতার চিন্তাশক্তির প্রকৃষ্ট সংবদ্ধতায় পরিবেশন করেন তখনই সেই রচনা সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে অনন্য হয়ে উঠে প্রবন্ধের রূপ ধারণ করে। সাহিত্যের রূপ-রীতিগত বিভাগ অনুসারে প্রবন্ধ দু'প্রকার— বস্তুগত প্রবন্ধ এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ব্যক্তিগত প্রবন্ধে ব্যক্তিচিন্তা অপেক্ষা ব্যক্তিহৃদয় প্রাধান্য পায় ঠিকই তবু তা গীতিকবিতার সমকক্ষ নয়। ভাবাবেগ থাকলেও সেক্ষেত্রে যুক্তির বন্ধন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির তীক্ষ্ণতায় প্রবন্ধের স্বাতন্ত্র্য সেখানে বজায় থাকে। সংযত ভাষার প্রকাশে, যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতায় তত্ত্ব ও তথ্যের প্রামাণ্যতায় আবদ্ধ হয়েও গল্প, উপন্যাস, নাটক কিংবা গীতিকবিতার মতো স্রষ্টা, সৃষ্টি ও উপভোক্তার মধ্যে কোন আবরণ রাখে না; স্বভাবতই এই ত্রিস্তরীয় যোগাযোগ হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ ও সাবলীল— এখানেই সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে প্রবন্ধ স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। সাহিত্য শাখার এই অনন্যতায় প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রতি আমি আকৃষ্ট এবং এরই ফলস্বরূপ আমার গবেষণাকর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। গবেষণার উদ্দেশ্য যদি অনুসন্ধান হয়, তবে সেই অনুসন্ধানকর্মে লিপ্ত হয়ে লক্ষ্য করেছি প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিকবৃন্দ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রাসাদ সৌধ নির্মাণ করলেও সেই অঙ্গনে এমন অনেক প্রাবন্ধিক পদার্পণ করেছেন যাঁদের স্বতন্ত্র কারুশিল্প বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রাসাদ সৌধকে পূর্ণতা দান করলেও অনেকাংশেই তাঁরা আজও অনালোচিত। বহু আলোচিত ঠাকুর পরিবারজাত এমনই এক অনালোচিত প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ সাহিত্যের সৃষ্টি ও শৈলীর অনুসন্ধানই আমার লক্ষ্য।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-৩
প্রথম অধ্যায়	৪-৩৫
ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ ও বলেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য	
দ্বিতীয় অধ্যায়	৩৬-৫৬
বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়	
তৃতীয় অধ্যায়	৫৭-৭৬
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য: বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের নিজস্বতা	
চতুর্থ অধ্যায়	৭৭-৯৯
প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি, চিত্র-ভাস্কর্য বিষয়ক প্রবন্ধ	
পঞ্চম অধ্যায়	১০০-১১৬
বাংলা সাহিত্যচর্চা : বলেন্দ্রনাথের বহুমুখী গতিমুখ	

ষষ্ঠ অধ্যায় ১১৭-১৩৩

বাংলায় রম্যরচনা: বলেন্দ্রনাথের স্থান

সপ্তম অধ্যায় ১৩৪-১৬০

বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের শৈলী বিচার

উপসংহার ১৬১-১৬৯

গ্রন্থপঞ্জী ১৭০-১৭৪

- আকর গ্রন্থ
- সহায়ক গ্রন্থ

পরিশিষ্ট ১৭৫-১৮১

ভূমিকা

ভূমিকা

যে কয়েকজন প্রতিভাধর বাঙালী সাহিত্যিক স্বল্পস্থায়ী জীবনে সাহিত্যলীলা সমাপ্ত করে অকালে মৃত্যুর রহস্যময় দিগন্তে বিলীন হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির বিরল প্রতিভাধর প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র— বাংলা সাহিত্যের একজন ভাবমুগ্ধ প্রবন্ধকার। মাত্র ২৯ বছর বয়সেই তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয় কিন্তু তাঁর এই স্বল্পায়ু জীবনে বাংলা সাহিত্যের সেবায় তিনি যা রেখে গেছেন বাংলা সাহিত্যের মন্দিরে তা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। ছাপান্নটি গদ্য নিবন্ধ, দু'খানি কবিতাগ্রন্থ, কতকগুলি সনেট, দুটি বড় কবিতার নাতি দীর্ঘ সংগ্রহ বলেন্দ্রনাথের প্রকাশিত রচনার পরিধি মাত্র এই পর্যন্ত। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর নবীনতায়, ভাবের গভীরতায়, বর্ণনার মনোহারিত্বে ও প্রকাশ ভঙ্গীর কলা-নৈপুন্যে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি বাংলা ভাষায় তো বটেই যেকোন ভাষায় শ্রেষ্ঠ রচনার বিচারে অনবদ্য।

বানভট্ট বিরচিত 'কাদম্বরী' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন— ''কাদম্বরী যিনি উপভোগ করিতে চান, তাঁহাকে ভুলিতে হইবে যে আপিসের বেলা হইয়াছে; মনে করিতে হইবে যে, তিনি বাক্যরস বিলাসী রাজ্যেশ্বর, বিশেষ রাজসভা মধ্যে সমাসীন।''— এই উক্তিটি বলেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে অনুবাদ অনুসরণের পথ পরিত্যাগ করে বাংলা গদ্য সাহিত্য অনেকটা পরিমাণে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠবার চেষ্টা করেছিল। ফলে মৌলিক রচনার সূত্রপাত হল। আর তারই প্রয়াস পরিস্ফুট হতে লাগল বিভিন্ন বিষয়ানুযায়ী প্রবন্ধে-নিবন্ধে। বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়াও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের প্রসন্ন দক্ষিণ হাতের স্পর্শ অধিকমাত্রায় অনুকূল ছিল। আর তাঁর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে গদ্যরচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন

প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে বাস করলেও তাঁর প্রবন্ধে ছিল ষোল আনা মৌলিকতার ছাপ। বিষয়েও ছিল বৈচিত্র্যের বাহার ও অভিনবত্ব।

বলেন্দ্রনাথ এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেখানে আবির্ভাব ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের 'দক্ষিণপাণির প্রসন্ন আশীর্বাদ' বলেন্দ্রনাথকে সম্পদশালী করে তুলেছিল। বক্তব্যকে হৃদয় বর্ণে রঞ্জিত করে তাকে শিল্পশ্রীমণ্ডিত করে তোলাই ছিল প্রাবন্ধিকের মৌলিক ধর্ম। এইক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বাংলা গদ্যকে ভাবের সাহিত্যে উন্নীত করেছিলেন বলেই আত্মগত ভাবনা কামনার পক্ষ নির্ভর করে তিনি রোমান্টিকতার আকাশে ডানা মেলে দিয়েছিলেন। বলেন্দ্রনাথের রচনায় বৈচিত্র্য ছিল বলেই তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচনেও বৈচিত্র্য ঘটেছে। কখনো প্রাচীন ভারতীয় কাব্য সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, কখনো প্রাচীন ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি, চিত্র ভাস্কর্য সম্পর্কে আলোচনায় নিবিষ্ট হয়েছেন।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান নির্ণয়ই আমার মূল লক্ষ্য। আলোচনাসূত্রে আমি দেখাতে চাই যে অধিকাংশ সমালোচক বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে রবীন্দ্র প্রভাব সম্বন্ধে যে একতরফা মন্তব্যগুলি করেছেন, তা আদৌ যে সত্য নয় তা প্রমাণ করা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে রবীন্দ্র প্রবন্ধে যে উত্তরাধিকার তাঁর উপর বর্তেছিল, তাঁর উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও তিনি কতটুকু রবীন্দ্রানুসারী সে বিষয়ে প্রচলিত তথ্য সমূহের বাইরে থেকে আমি নতুন নতুন তথ্য সংযোজন করব। এরপর অতিসংক্ষেপে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিষয় ও শৈলী সম্পর্কে আমার মৌল প্রতিপাদ্য জানিয়ে বলেন্দ্রনাথ যে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারার একজন শক্তিশালী প্রাবন্ধিক তা প্রমাণ করবো।

প্রথম অধ্যায়

ঠাকুর বাড়ির পরিবেশ
ও
বলেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য

প্রথম অধ্যায়

ঠাকুর বাড়ির পরিবেশ ও বলেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কের দিক থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথের একমাত্র সন্তান। মাতার নাম প্রফুল্লময়ী দেবী। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্র-উত্তরকালে যাঁরা জন্মগ্রহণ করে জীবনের স্ব স্ব ক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ অন্যতম। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন একটি বিরল প্রতিভা যা ঐ পরিবারের অন্য সদস্যদের নাম উচ্চারিতের সঙ্গে 'শুধু' 'ইত্যাদি' হিসাবে উল্লেখ মাত্র করলেই কর্তব্য সম্পন্ন করা যায় না। ১৮৭০ সালে বলেন্দ্রনাথের জন্ম এবং ১৮৯৯ সালে মাত্র ২৯ বছর বয়সেই তাঁকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়। তবুও স্বল্পকালীন জীবনে বাংলা সাহিত্যের সেবায় তিনি যা দিয়ে গেছেন তা পরিমাণে বিরাট কিছু হতে না পারলেও গুণ বা উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠতার বিচারে তা সমস্তটাই হচ্ছে প্রথমশ্রেণীর।

বলেন্দ্রনাথ পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁর জন্মের পূর্বকাল থেকেই পিতা উন্মাদ, জন্মাবধি পঙ্গু। তাই ঠাকুরবাড়ির জনাকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে এমন কি বাইরের বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যেও স্বাভাবিক কারণেই বলেন্দ্রনাথের অন্তর ছিল বিষণ্ণ ও ব্যথিত। এর মধ্যে দিয়েই বলেন্দ্রনাথ বড় হয়ে উঠেছিলেন। তাই শিশুকাল থেকেই বড় হবার এক ঐকান্তিক প্রচেষ্টা শুধু তাকে নয়, তাঁর মা-কেও বেশ সচেতন করে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথের মা প্রফুল্লময়ী দেবীর মন্তব্য স্মরণযোগ্য—

> "বাপের ওইরকম অবস্থা হওয়াতে তার মনে তখন হইতেই একটা বড় হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। যখন আটনয় বছরের, সেই সময় আমাকে প্রায় বলিত যে সে লেখাপড়া শিখিয়া ইঞ্জিনীয়ার হইবে। লেখাপড়া তাহার নিকট একটা প্রিয় বস্তু ছিল। কোনওদিন তাহাতে অবহেলা করে নাই।"[১]

যেমন একটি অট্টালিকার প্রাথমিক প্রস্তুতি হল তার ভিত্তিভূমির প্রস্তুতি। এই

ভিত্তিভূমির দৃঢ়তার উপরেই নির্ভর করবে অট্টালিকার গুরুভার গ্রহণের ক্ষমতা। ঠিক সেভাবেই বলা যায় যেকোন মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রতিভার প্রকাশের পিছনে তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয় জীবনে নিজে গামছা পরিধান করে নিজবস্ত্র অপরকে দান করার মধ্যেই যেমন তাঁর দয়ার সাগরের ব্যক্তিত্বটি লুকিয়ে ছিল, বিলের ধ্যান ধ্যান খেলার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ। ঠিক একইভাবে ঠাকুরবাড়ির মনীষীদের ছেলেবেলার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা পরবর্তীকালে কবি রবীন্দ্রনাথ, চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথ ও প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের পরিচয়টুকু আরো সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' এবং অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' ও 'আপনকথা' তাঁদের বাল্যজীবনের প্রামাণ্য তথ্য। কিন্তু স্বল্পভাষী ও অন্তর্মুখী বলেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা এমন কোন প্রামাণ্য তথ্য পাই না। এক্ষেত্রে বলেন্দ্রনাথের ছেলেবেলাকে কিছু চিঠিপত্র, রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতি ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত রেখাচিত্রের উপর নির্ভর করেই কিয়দংশ অনুমান করে নিতে হয়।

যে বাড়িতে শৈশবের দিনগুলি শুরু হয়েছিল বলেন্দ্রনাথের, সেটি আর পাঁচটি সাধারণবাড়ির মতো ছিলনা। নগর কলকাতার সবচাইতে অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত বাড়িটির পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের। আর এই পরিবেশেই বিকশিত হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির এক একটি নক্ষত্রসম ব্যক্তিত্বের। প্রিন্স দ্বারকানাথ দিয়ে যার সূচনা ঘটেছিল পরবর্তীতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, ইন্দিরাদেবী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আমার আলোচ্য প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বস্তুতপক্ষে সৃষ্টিশীলতাই ছিল ঠাকুর পরিবারের রক্তে। তবে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে কাব্যে, সঙ্গীতে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, চিত্রশিল্পে শাখায়-প্রশাখায় তাঁর সৃষ্টিশীলতাকে পরিব্যাপ্ত করেছিলেন ঠিক ততোধিক না হলেও ঠাকুরবাড়ির প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে আপন সৃষ্টিশীলতার পূর্ণ স্বাক্ষরটি রেখে গেছেন। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যরচনা, স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য রচনা ও পত্রিকা সম্পাদনা, অবনীন্দ্রনাথের রং-তুলিতে সে স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তৎকালীন সমাজে যে পরিবারের মেয়েরাও পিছিয়ে

ছিল না এমনই এক পরিবারের সন্তান বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরও যে আপন ভঙ্গিতে তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয় দেবেন সেটাই স্বাভাবিক। আধুনিক শিশু মনস্তত্ত্ব একথাই বলে যে একজন শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে দুইটি বিশেষ ক্ষেত্রের প্রভাবে। প্রথমত, তাঁর বংশগতি, দ্বিতীয়ত, পরিবেশ। এক্ষেত্রে বলেন্দ্রনাথের পক্ষে দুটিই ছিল ধন্যাত্মক। বংশধারায় তিনি ঠাকুর পরিবারে সন্তান আর ঠাকুরবাড়ির মননশীল পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশু যে মনীষী হবেন তা বলাই বাহুল্য। যেহেতু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন প্রামাণ্য ছেলেবেলা পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে ঠাকুরবাড়ির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোধহয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আরো সহজভাবে বোঝা যাবে। ঐতিহ্যশীল ঠাকুরবাড়ির জীবনে প্রতিটি অধ্যায়ই ছিল ব্যতিক্রমী। তাই আজও রান্নাবান্না ইত্যাদির মতো জীবনের সাধারণদিকগুলি নিয়েও চলছে গবেষণা। আর এইরকম একটি মননশীল পরিবারের নামকরণ প্রথাটিও যে বেশ ব্যতিক্রমী হবে সেটাই স্বাভাবিক।

ঠাকুর পরিবারের সন্তানদের নামকরণে একটি বিশেষ রীতি একটু লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বে। একেবারে উদ্ভবের ইতিহাস বাদ দিলে মোটামুটিভাবে ঠাকুর পরিবারের সূচনা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে দিয়ে। এখান থেকেই ঠাকুর পরিবারের নামকরণের বৈশিষ্ট্যটিও প্রবাহিত হচ্ছে। দ্বারকানাথ অর্থাৎ দ্বারকার নাথ বা পতি শ্রীকৃষ্ণ। এরপর দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর নামের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রেখে তাঁর নামের আদ্যক্ষর 'দ' দিয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাখেন দেবেন্দ্রনাথ (যদিও অন্য পুত্রদের নাম 'দ' দিয়ে রাখা না হলেও প্রতিটি নামই ছিল অর্থবহ)। এই রীতি অনুসারে ঠাকুর বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম 'দ' দিয়ে রাখার এক উত্তরাধিকার যেন গড়ে ওঠে। এই উত্তরাধিকার পরপর পাঁচটি প্রজন্মে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে নিঃসন্তান দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরে এসে সমাপ্ত হয়। তৎকালে বিশেষত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে বাংলার জমিদার পরিবারগুলির মধ্যে নামের প্রথম অক্ষরে জ্যেষ্ঠ উত্তরাধিকারীকে চিহ্নিত করার যেন এক প্রথা লক্ষ করা যায়। আর সেই প্রথারই প্রতিফলন দেখা যায় ঠাকুর পরিবারেও। তবে ঠাকুর বাড়ির নামকরণে বিশেষ অর্থব্যঞ্জনা ও পূর্বপুরুষের সঙ্গে সম্পর্কের দিকটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হত, এবং প্রতিটি নামের সঙ্গে 'ইন্দ্র' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এই শব্দটি যুক্ত করে পরিবারের মান বা মর্যাদার দিকটিকে যেন বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হতো। আর ঠাকুর পরিবারে প্রতিটি নাম যেন প্রকৃত অর্থেই

প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে আরো উজ্জ্বল করে তুলতো। যেমন দেবেন্দ্রনাথের অর্থ দেবশ্রেষ্ঠ। বাস্তবজীবনেও তিনি ধর্মচর্চায় ছিলেন মত্ত। রবীন্দ্রনাথ কথাটির অর্থ রবি=সূর্য, ইন্দ্র= শ্রেষ্ঠ, নাথ= পতি অর্থাৎ নক্ষত্রশ্রেষ্ঠ সূর্যদেব। রবীন্দ্রনাথও আপন প্রতিভাকে বাস্তবজীবনে সূর্যালোকের মতই প্রসারিত বা উন্মোচিত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ঠাকুর পরিবারে জ্যেষ্ঠ সন্তানের পরের পুত্র সন্তানদের নামকরণ অন্য অক্ষর দিয়ে হলেও তাঁদেরও জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুক্রমে তাঁদের নামের প্রথম অক্ষরের উত্তরাধিকার প্রবর্তিত হতো।

যেমন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম রাখা হয়েছিল রথীন্দ্রনাথ। ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্রের নাম রাখা হয় বলেন্দ্রনাথ। এক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বলেন্দ্রনাথের নামকরণটি করেছিলেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আবার আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, দেবেন্দ্রনাথের প্রতিশব্দ হল বীরেন্দ্র, বলেন্দ্র ইত্যাদি শব্দগুলি অর্থাৎ বংশগতিবাদ এই নামকরণের মধ্যেই বিশেষভাবে চিহ্নিত। তবে বলেন্দ্রনাথের নামটির ক্ষেত্রে বোধহয় একটু অন্য ব্যাখ্যা ভাবলে ভুল হবে না। বলেন্দ্র = বল+ ইন্দ্র অর্থাৎ বলশ্রেষ্ঠ বা বলিষ্ঠ। যদিও বলেন্দ্রনাথের মাতা প্রফুল্লময়ী দেবীর 'আমাদের কথা' শীর্ষক স্মৃতিচারণা থেকে আমরা জানতে পারি যে বলেন্দ্রনাথ ছিলেন জন্মাবধি রুগ্ন এবং শারীরিকভাবে দুর্বল। তাঁর দুটি পাও ছিল ঈষৎ বাঁকা। প্রফুল্লদেবীর বর্ণনা অনুসারে তার কারণটি ছিল—

> ''সে ভূমিষ্ঠ হইবার পর একেবারেই কোনও কান্নার শব্দ পাওয়া যায় নাই। নিস্তেজ অবস্থায় পড়িয়াছিল। তাহার পর ডাক্তারেরা নানা উপায়ে তাঁহাকে কাঁদাইতে সক্ষম হন। আমারও সেই সময় খুবই অসুখ। নাড়ী ছাড়িয়া কয়েকদিন অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছিলাম। আমার নানারকম মনের অশান্তির মধ্যে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহারও শরীরটা তেমন সুস্থ ছিল না, দুটি পাও একটু বাঁকা মতন হইয়াছিল।''[২]

স্বাভাবিকভাবে দেখলে হয়তো মনে হতে পারে এমন একটি রুগ্ন সন্তানের নাম বলেন্দ্রনাথ রাখা বোধহয় তাকে পরিহাস করারই সামিল। এ যেন কানা ছেলের নাম পদ্মালোচনেরই প্রতিরূপ। কিন্তু এখানেই ঠাকুরবাড়ির অনন্যতা যে ঠাকুরবাড়ির

চিন্তাশীলতায় ছিল দূরদৃষ্টি ও ব্যঞ্জনার প্রকাশ। শারীরিকভাবে দুর্বল এই বলেন্দ্রনাথ ছিলেন মানসিক দিক থেকে অপরিসীম উদ্যমী। তাই পিতামহ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৌত্রের নামের আক্ষরিক অর্থ অপেক্ষা ভাবার্থ বা ব্যঞ্জনাকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বলেন্দ্রনাথ যে শারীরিকভাবে না হলেও প্রকৃতই বলশ্রেষ্ঠ ছিলেন তা তিনি তাঁর লেখনী ও কর্মযোগের বলেই প্রমাণ করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে এ অধ্যায়ের পরবর্তীতে বিশদভাবে আলোচনা করবো।

ঠাকুরবাড়ির কৃতি সন্তানদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ এই ত্রয়ী প্রতিভার পারস্পরিক সম্পর্কটি ছিল এরূপ—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বলেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথের পিতৃব্য আর বলেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন ভ্রাতা। তবে এই ত্রয়ী প্রতিভার বয়সের ব্যবধান বিশেষ ছিলনা। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ আর বলেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৭০ এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হন ১৮৭১। অর্থাৎ বলেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের বয়সের পার্থক্য ছিল একবছরের, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের নয় বছরের ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বয়সের পার্থক্য ছিল ১০ বছরের। ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে এই বয়সের ব্যবধান আকাশ প্রমাণ কিছু ছিল না। ঠাকুরবাড়ির এই তিনসন্তানের বড় হয়ে ওঠার দিনগুলির মধ্যেও বিশেষ কোন হেরফের ছিল না।

ঠাকুরবাড়ির অন্তরমহলে নারীরা কোনদিনই সন্তান প্রতিপালনের দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করতেন না। তাঁদের মূল দায়িত্ব ছিল বাড়ির পুরুষদের আহার বিহার, বিলাসব্যসন, সংস্কৃতিচর্চায় সহায়িকার ভূমিকা পালন। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে তার প্রমাণও মেলে—

> ''এই তো তখনকার কালের বিশেষত্ব, তাহার' পরে আবার বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই ছিল না। আসলে আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদের বিনোদনের জন্য।''[৩]

এজন্যই জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির ভৃত্য-রাজকতন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। চাকর শ্যামের কাছেই কেটেছিল রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার দিনগুলি। একইভাবে পদ্মদাসীর কোলে পিঠে বড় হয়ে উঠেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। এদিক থেকে বলেন্দ্রনাথের জীবনটা ছিল কিছুটা ভিন্নগতির। জন্মরুগ্ন এই সন্তানটিকে মাতা প্রফুল্লময়ী দেবী কিন্তু বাড়ির

পরিচারিকা পরিচারকের হাতে ছেড়ে ঠাকুরবাড়ির কর্মযজ্ঞে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করতে পারেন নি। বলেন্দ্রনাথের জীবনে এই মায়ের সান্নিধ্যলাভের কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে বলেন্দ্রনাথের পিতা বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন উন্মাদ। স্বভাবতই স্ত্রী প্রফুল্লময়ী দেবী জীবনের এই যন্ত্রনাটি হয়তো বা সন্তানের সান্নিধ্যে থেকে ভুলে থাকার চেষ্টা করতেন। দ্বিতীয়ত, স্বয়ং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির আর পাঁচজন সন্তানের মতো সুস্থ, সবল ছিলেন না। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বলেন্দ্রনাথের দুটি পা ছিল ঈষৎ বাঁকা। তাই তিনি অনেকদিন পর্যন্ত পা ঘসে ঘসে চলতেন আর এই নিয়ে ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য সমবয়সী সন্তানেরা তাঁকে ঠাট্টা করতেন। অন্তমুর্খী স্বল্পভাষী সন্তানের এই দুর্বলতা ও মানসিক যন্ত্রণাকে দূরে রাখতেই হয়তো বা মাতা প্রফুল্লময়ী দেবী পরিচারক- পরিচারিকার হাতে বলেন্দ্রনাথের দায়ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। কারণ যাইহোক ঠাকুরবাড়ির রীতি অনুসারে বলেন্দ্রনাথের ছেলেবেলা ভৃত্যরাজকতন্ত্র নয়, মাতৃস্নেহ স্পর্শেই কেটেছিল একথা প্রমাণিত সত্য—

> ‘‘বলু যখন সাড়ে চার বছরের, তখন আমার কাছেই তাহার হাতে খড়ি হয়। তখন হইতে পাঁচ বছর পর্যন্ত আমি নিজেই তাকে অল্প অল্প পড়াইতাম।’’[৪]

বাল্যকালে বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সেখানে কয়েক বছর পড়াশুনা করার পর হেয়ার স্কুলে চলে যান এবং সেখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অল্পবয়স থেকেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁকে লেখনী ধারণে সমর্থ করে তোলে। প্রথমে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি থেকে প্রকাশিত ‘বালক’ নামক পত্রে তিনি লিখতেন পরে ‘সাধনা’র নিয়মিত লেখক হয়ে ওঠেন। বলেন্দ্রনাথের এই মননশীলতা গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির পরিবেশ। প্রপিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথের কর্মযোগ, পিতামহ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মসাধনার উত্তরাধিকারের সাথে সাথে পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার দ্বারা বলেন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ঠাকুরপরিবারে যে কজন অনুজ আত্মীয় রবীন্দ্রনাথের সংকল্প ও সাধনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম বলেন্দ্রনাথ। বলেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র, নাতি-পরিসর জীবনের মধ্যেই তিনি বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী,

রম্যরচনা, ললিতকলা বিষয়ক প্রবন্ধে তিনি তাঁর স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। বাংলা সনেটের গোড়ার রূপকারদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ঠাকুরবাড়ির আর এক অন্যতম সদস্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন চিত্রকর হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করছেন তখন বলেন্দ্রনাথ ঐ শিল্পকলা বিষয়ে আলোচনামূলক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। 'সাধনা' পত্রিকা সম্পাদনার কাজে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত সৈনিক হিসাবে বলেন্দ্রনাথকেই ধরা হয়। শিলাইদহে জমিদারি তদারকিতে ব্যস্ত রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথকে পত্রিকা সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ পাঠাতেন। তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথেরই প্রিয় ছিলেন না সঙ্গে কাকিমা মৃণালিনীর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। যদিও এই তালিকায় নীতীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথও ছিলেন। অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের মুখচ্ছবিতে ও কর্মতৎপরতায় বলেন্দ্রনাথ যেন একটি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ ছিলেন। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য তাঁকে সাহিত্যরচনায় পথ দেখালেও নিজ সাহিত্য কর্ম সৃষ্টিতে নিজস্বতা ছিল লক্ষ করার মত।

ব্যক্তিগত সম্পর্কেও ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ এবং সহোদরা ইন্দিরা দেবী ছাড়া বলেন্দ্রনাথের মত রবীন্দ্রনাথের নিবিড়তা সিক্ত ঠাকুরবাড়ির অন্য কেউ হতে পারেন নি। কেবল স্নেহ নয়, মানসিক ও শৈল্পিক লালনের ভারটিও ছিল রবীন্দ্রনাথের উপর। ১৮৮১তে ঠাকুর বাড়িতে আয়োজিত এক অধিবেশনে কবি-নাট্যকার-গীতিকার-সুরকার-পরিচালক-অভিনেতা ও গায়ক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ২০ বছর বয়সে তাঁর 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় আপন প্রতিভার বিচ্ছুরণটি দেখিয়েছিলেন। তবে গৃহে আয়োজিত এরূপ নাট্য অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজদের সহযোগিতা পেলেও বয়সের-ব্যবধানে যেহেতু তিনি তাঁর ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্নিদের কাছাকাছি ছিলেন তাই তাঁর নাট্য প্রেরণার উদ্যমে এরাই ছিলেন বেশি উৎসাহী। আর রবীন্দ্রনাথের এই ভাইপো-ভাইঝি-ভাগ্নিদের মধ্যে এই শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা নিকট সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র নাট্যের অভিনেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। প্রথমে 'বালক' পত্রিকা (১২৯২ বঙ্গাব্দ) এবং পরে 'ভারতী ও বালক' এর পৃষ্ঠায় ঠাকুরবাড়ির প্রায় সমবয়স্ক অনেকেই বাংলা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। জিতেন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ এমন কি সুরেন্দ্রনাথও ছিলেন। এঁদের সকলেরই গদ্য-পদ্য রচনা রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত নয়। প্রথমদিকে কিছুকাল সকলের

লেখাই কবির হাতের পরিমার্জনা অবশ্যই লাভ করেছিল। তাহলেও বলেন্দ্রনাথের সমগ্র মনও কারুকর্মকে কবি যেন আপন হাতে তুলে নিয়েছিলেন— এতখানি আন্তরিকতা অন্য কারুর প্রতি দেখা যায় নি। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র বলেন্দ্রনাথের নিঃসঙ্গ জীবনই একমাত্র কারণ ছিলনা, দু'জনেই মনের দিক থেকে ছিলেন সমধর্মী, দু'জনেই ইনট্রোভার্ট।

এই স্বভাবের সাদৃশ্য বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথকে কাকা ও ভাইপোর সম্পর্ক ছাড়াও এক আত্মার আত্মীয়তায় বেঁধে রেখেছিল। বলেন্দ্রনাথের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসা, উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার জীবন্ত চিত্রখানি মেলে 'ছিন্নপত্রাবলী'র এক পত্রে। সপরিবারে শিলাইদহে বেড়াতে গিয়ে উন্মুক্ত নদীর চড়ায় পরিভ্রমণকালে একসময় বলেন্দ্রনাথ পরিবারের দুই রমনীর সঙ্গে চড়ে ঘুরতে ঘুরতে চড়া বেয়ে ওপারে পৌঁছে যান এবং আর ফিরতে পারেন না। এই সময় রবীন্দ্রনাথের-ব্যাকুলতাখানি লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> "একবার বলু বলে পুরো জোরে চীৎকার করলুম— কণ্ঠস্বর হু হু করতে করতে দশদিকে ছুটে গেল, কিন্তু কারো সাড়া পেলুম না, তখন বুকটা হঠাৎ চারদিক থেকে দমে গেল...মনে হল চোরাবালিতে পড়েছে, কখনো মনে হল বলুর হয়তো হঠাৎ মূর্ছা কিংবা কিছু একটা হয়েছে, কখনো বা নানাবিধ শ্বাপদ জন্তুর বিভীষিকা কল্পনার উদয় হতে লাগল।...বেশ বুঝতে পারলুম বলু বেচারা ভালোমানুষ, দুই বন্ধনমুক্ত রমণীর পাল্লায় পড়ে বিপদে পড়েছে।"[৫]

জন্মাবধি কিছুটা দুর্বল প্রকৃতির ভাইপো বলেন্দ্রনাথের জন্য রবীন্দ্রনাথের ব্যাকুলতাখানি এখানে লক্ষণীয়। বলেন্দ্রনাথকে খুঁজে না পেয়ে এই যে বিবিধ প্রকৃতির আশঙ্কায় আশঙ্কিত হওয়া বিশেষত তাঁর মুর্চ্ছা যাওয়ার আশঙ্কাটি দেখেই বোঝা যায় উভয়ের সম্পর্কের গভীরতাটি ছিল কতখানি।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই শারীরিক দুর্বলতা এবং পিতার উন্মাদ অবস্থা তাঁর সমবয়সীদের কাছে তাঁকে হাস্যস্পদ করে তুলেছিল, তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্বল্পভাষী, অন্তর্মুখী। আর ঠিক সেইকারণেই বলেন্দ্রনাথ অনুভূতিশীল রবীন্দ্রনাথের স্নেহসান্নিধ্যের

আধিক্যে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং বলেন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। তবে এক্ষেত্রে যে বিষয়টির দিকে আলোকপাত করব সেটি হল রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে বলেন্দ্র জীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছায়াপাত সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রসৃষ্টি ধারায় সর্বাপেক্ষা বাস্তবসম্মত এবং ধূলামাটির কাছাকাছি রচনা হল তাঁর 'গল্পগুচ্ছ'। এখানে রোমান্টিকতার পেলব জগৎ থেকে নেমে এসে কবি মাটির কাছে ঘামের গন্ধের মানুষদেরই কথা লিখেছেন। বাস্তব জীবনে দেখা মানুষগুলি তাঁর গল্পে হয়ে উঠেছে মৃন্ময়ী, রতন, ফটিক, তারাপদ। এর প্রমাণ মেলে ছিন্নপত্রাবলীর পৃষ্ঠায়। এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই একথা অনুমান করা বোধহয় বিশেষ ভুল হবে না যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত 'বলাই' শীর্ষক গল্পটিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলাইয়ের মধ্যে তাঁর ভাইপো বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যেন ছায়াপাত ঘটেছে। এ অনুমান প্রমাণিত সত্য নয় বরং বিপক্ষে যুক্তিটিও নেহাৎ দুর্বল নয়। কারণ 'বলাই' গল্পে বলাই জন্মাবধি মাতৃহারা এবং পিতা সুস্থ ও বিলেতবাসী। কিন্তু বাস্তবজীবনে বলেন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের মৃত্যুর পূর্বেই পরলোক গমন করেন এবং পিতা বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন উন্মাদ। তবু এইটুকু বৈসাদৃশ্যের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ না করলে 'বলাই' গল্পে বলেন্দ্রনাথের যে ছায়াপাত ঘটেছে এ অনুমান বিশেষ ভ্রান্ত বলে মনে হয় না।

প্রথমত, 'বলাই' গল্পের এই নামকরণের মধ্যেই রয়েছে বলেন্দ্রনাথ ওরফে বলু নামটির প্রত্যক্ষ প্রভাব।

দ্বিতীয়ত, এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন উত্তম পুরুষে। গল্পটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে প্রথম পংক্তিটি সূচিত হচ্ছে এইভাবে—

> ''আমার ভাইপো বলাই...।''[৬]

উক্ত পংক্তিটি পাঠ করলেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ অবচেতন মনে এই গল্পে বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটিকে হঠাৎ প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করে নিলেন।

তৃতীয়ত,

> ''তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূলসুরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নড়েচড়ে বেড়ানো নয়।''[৭]

এখানেও যেন বলেন্দ্রনাথের ঈষৎ বাঁকা পায়ের প্রতিকূলতার কথাই স্মরণ করায়। তাছাড়াও

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রের মিতভাষিতা, অন্তর্মুখীনতা, দার্শনিক চেতনা, প্রকৃতিপ্রেমিক মনোভাব এবং জীবনের নিঃসঙ্গ একাকিত্বটুকু এই গল্পে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে—

> ''ওই ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ-মেলে-সর্বদা তাকিয়ে থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়।''[৮]

চতুর্থত, রবীন্দ্রনাথ বলাই গল্পে এক জায়গায় লিখছেন—

> ''বলাই অনেক দিন থেকে বুঝতে পেরেছিল কতকগুলো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই-ওর চারিদিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।''[৯]

এখানে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিপ্রবণ বালক বলাইয়ের গাছের প্রতি ভালোবাসা এবং তাতে তার সমবয়সী বন্ধুদের ব্যঙ্গের বিষয়ে এ অংশটির অবতারণা করেছেন। কিন্তু ব্যক্তি বলেন্দ্রনাথের জীবনে এটাই বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছিল তাঁর শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে। মাতা প্রফুল্লময়ী দেবীর স্মৃতিচারণায় এ তথ্য বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ রাখে—

> ''...তাহারও শরীরটা তেমন সুস্থ ছিলনা, দুটি পাও একটু বাঁকা মতন হইয়াছিল। তাহার দরুণ অনেকদিন পর্যন্ত পা ঘষিয়া ঘষিয়া চলিত।... সে তার মামাতো ও জ্যেঠতুতো ভাইদের সঙ্গে আমাদের সরকারী গাড়িতে করিয়া পড়িতে যাইত কিন্তু তার পায়ের দোষ থাকায় অন্য ভাইরা ঠাট্টা করিত।''[১০]

এখানে ব্যক্তি বলেন্দ্রনাথেরও একান্ত নিজস্ব ব্যথা ছিল যা গল্পে বলাইয়ের সাথে কোথাও যেন মিশে যায়।

পঞ্চমত, মাতা প্রফুল্লময়ী দেবীর স্মৃতিচারণা থেকে আমরা জানাতে পারি যে বলেন্দ্রনাথের ছেলেবেলা থেকেই ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার শখ ছিল—

> ''...সেই সময় আমাকে প্রায় বলিত যে সে লেখাপড়া শিখিয়া ইঞ্জিনিয়ার হইবে।''[১১]

'বলাই' গল্পেও দেখি তার পিতা স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিলেতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেছেন এবং ছেলে বলাইকে বিলাতি কায়দায় শিক্ষা দেবেন বলে প্রথমে শিমলা পরে বিলেতে নিয়ে যাবেন বলে ভেবেছেন।

এইভাবে বলা যায় যে প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথ প্রিয় ভাইপো বলেন্দ্রনাথের চরিত্রের ক্ষীণ আভাসটুকু যেন 'বলাই' গল্পে ফুটে উঠেছে। আর এখানেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্য। যেখানে এক সদস্যের দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণাকে অপর সদস্যও নিজের মনে করে আত্মস্থ করতেন বলে সৃষ্টির মধ্যেও সেগুলি ফুটে ওঠে।

ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথের জীবনে আরো বহু বৈচিত্র্যময় অজানা তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। মূর্তি পূজায় অবিশ্বাসী ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ঠাকুর পরিবারের উদার মানসিকতার মধ্যেও চর্চিত হত জ্যোতিষ শাস্ত্র, রাশিচক্র গণনা, প্রেতচক্রের চর্চা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এসব বিশ্বাস থেকে মুক্ত ছিলেন না। তিনি নিজেও প্রেতচক্রে বসে পূর্বপুরুষদের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। একইভাবে প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাবন্ধিক পরিচয়টুকু ছাড়াও তিনি ছিলেন জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ। স্বয়ং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির সদস্য দেবেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, কাদম্বরী ও রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্মছক নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনী গ্রন্থে যে জন্মছকটি ব্যবহৃত হয় সেটি তৈরি করেছিলেন আমার আলোচ্য প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথ।

বলেন্দ্রনাথ এই অন্তর্মুখী মন নিয়েই ভারতবর্ষের তীর্থপথে পরিভ্রমণ করেছেন অবিরাম অবিরত। তাঁর স্বভাবের এই অন্তর্মুখীনতা ভারতমগ্নতায় পরিণত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেখানেও আত্ম আবিষ্কারের কৌতূহলের স্পষ্ট ব্যঞ্জনাই পরিস্ফুট হয়েছে। এই আত্ম দর্শনের মধ্য দিয়েই তিনি সৌন্দর্যের বিপুল ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিলেন। আর এই অনুভব থেকেই তাঁর প্রবন্ধ রচনার সূচনা। মাতা প্রফুল্লময়ী দেবী এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ''যখন ওর তের বছর বয়স সেই সময় আমরা একবার শ্রীরামপুরে যাই। সেখানে থাকিবার সময় একদিন একটা মাঝি নৌকায় চড়িয়া গান গাইতে গাইতে যাইতেছিল আমার 'খুড়ো-খুড়ী পায়নামুড়ী' ইত্যাদি। এই গান শোনার পর হইতেই ওর মনে কি একরকম ভাব উপস্থিত হয়, তখন হইতে সে প্রায়ই এক একটা প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে শোনাইত। বুঝিবার মত লেখাপড়া যদিও আমার তেমন জানা ছিল না, কিন্তু তবুও শুনিয়া ভালই লাগিত।

তখন হইতেই সাহিত্যের প্রতি তাহার দিন দিন অনুরাগ বৃদ্ধি পেতে লাগল।”[১২]

বলেন্দ্রনাথের ‘প্রবন্ধ’ রচনা সম্পর্কে মাতা প্রফুল্লময়ীর তথ্য যদি সঠিক হয় তবে বলেন্দ্রনাথের প্রথম লেখার সূচনা হয়েছিল ১৩ বছর বয়সেই। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ২৩ বছর। এর পর প্রায় দেড়বছর পরে ‘বালক’ পত্রিকায় যখন বলেন্দ্রনাথের প্রথম রচনা ‘একরাত্রি’ প্রকাশিত হতে থাকে তখন রবীন্দ্রনাথের ২৪ বছর পূর্ণ হয়েছে। তাই বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-বলেন্দ্র সম্পর্ক কেবল দাতা ও প্রাপকের নয়, নিছক মানসিকতার দিক থেকেও পারস্পরিক প্রবণতাও আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক একথা একবাক্যে স্মরণীয়।

বলেন্দ্রনাথের মন পৃথিবী ও প্রকৃতিকে, মানবমন ও মানব আদর্শকে যেভাবে দেখেছিল, উপলব্ধি করেছিল, উপভোগ করেছিল তাকেই আপন স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কখনো তিনি সাহিত্য সমালোচনা করেছেন, কখনো সাহিত্য সম্পর্কিত চিত্র সমালোচনা, আবার কখনো বা সামাজিক প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ কিংবা দেশীয় আচার ব্যবহার বিষয়ক প্রবন্ধে অন্তর্গূঢ় মনের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও রসানুভূতিই মনোরম হয়ে ফুটে উঠেছে। সত্যকার আনন্দের সঙ্গে তিনি নিজ আনন্দ ও উপভোগের পূর্ণতাকে আমাদের উপলব্ধিতেও আনবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে তাঁর সমস্ত রচনাই কোন না কোনভাবে সহজেই আমাদের হৃদয় হরণ করে।

প্রাচীন দেবস্থান বা পীঠস্থান প্রভৃতিতে তাঁর মনোযোগ আমাদেরও আকৃষ্ট করে। আরও কতকগুলি প্রবন্ধ আছে যেখানে নিছক প্রকৃতি বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। এক্ষেত্রে বেশীরভাগ রচনাই সমালোচনাজাতীয়। আর এই সমস্ত রচনাগুলির মধ্যে বলেন্দ্রনাথের কবিমনের পরিচয়টি প্রত্যেকক্ষেত্রে স্নিগ্ধরূপে প্রকাশ পেয়েছে। সৌন্দর্যে বিশ্বরূপ দর্শনই মানবজীবনের মহৎ কর্তব্য এটাই যেন বারবার তিনি বলতে চেয়েছেন।

মানুষের সৃষ্টি ও প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে অখণ্ডরূপের সন্ধান, যার অপর নাম সৌন্দর্য সন্ধান, এটাই বলেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্র সাহিত্য ও রবীন্দ্র মননের এই বিশেষ দিকটি বলেন্দ্রনাথের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যার ফলে তাঁর রচনা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে।

ইতিহাসের তথ্যস্তূপ থেকে জাতির প্রাণস্পন্দনকে আবিষ্কার করতে গিয়ে রোমান্টিক সৌন্দর্য মুগ্ধতায় নির্জীবে সজীবতা দান করেছেন। বলেন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি ছিল কলানুরাগসম্মিত। নবজাগরণের যুগে উনিশ শতকের প্রায় প্রথম থেকেই সাহিত্য সংস্কৃতি ঐতিহ্যের মধ্যে বাঙালি মানসের আত্ম উন্মোচনসূচিত হয়েছিল। কিন্তু চারুশিল্পের তপস্যা ও উপভোগ স্থাপত্য-চিত্রশিল্পে বাঙালী নবজাগরণের কিছুটা বিলম্ব ঘটেছিল— এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে ঠাকুর পরিবারের আন্তরিক একটা ভাবনা চিরকালই সক্রিয় ছিল। স্বভাবতঃই বলেন্দ্র প্রতিভাও সেই প্রভাব থেকে দূরে থাকেনি। তাঁর উৎসাহের প্রধান প্রেরণা ছিল চিত্র বিষয়ে পৌরাণিক ভাবনা।

বাংলা গদ্য বিকাশের ধারায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বলেন্দ্রনাথের অপেক্ষা কালের হিসেবে পরবর্তী হলেও মানের দিক থেকে নিজস্ব। এ প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ সেন যথার্থই বলেছেন—

> ''বলেন্দ্রনাথের ইহা কম প্রশংসার কথা নয় যে, প্রথম হইতেই তাঁহার রচনাপ্রণালী তাঁহার নিজের এবং তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার ইহা অপেক্ষা আর স্পষ্ট নিদর্শন কি থাকিতে পারে যে, যখন সমস্ত বঙ্গদেশ রবীন্দ্রনাথের বীণা ঝঙ্কারে কম্পিত উচ্ছলিত....., বলেন্দ্রনাথ তাঁহার ঘরের তাঁহার সেই শিক্ষাগুরুর প্রভাব হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।''[১৩]

কিন্তু তবু একথাও সত্য বলেন্দ্রনাথের রচনায় রবীন্দ্র প্রভাব অলক্ষ্য নয়, আর একথা সত্যই যে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত পূর্বতন লেখকের কাছ থেকে উত্তরসূরীকে ঋণ গ্রহণ করতেই হয়। তবে যে প্রতিভাধরের মধ্যে সত্যই প্রতিভা থাকবে সে স্বাধীন আকারে প্রকাশ পাবেই। বলেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। বয়সের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ আর বলেন্দ্রনাথের দূরত্ব প্রায় একদশক হলেও দুজনের অন্তমুর্খীনতা যোগ অনুসন্ধান। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা ও বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণাই হল অনুসন্ধান। নিভৃত প্রকৃতিতে, জীবন অভিজ্ঞতা এবং অনুভবের সাধর্মে বলেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্র ধর্মের নিবিড়তম অনুগামী। ঠাকুর বাড়ির বহু জনাকীর্ণ পরিবেশে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্রটি ছিলেন নিঃসঙ্গ উপেক্ষিত মনস্ক— আর তারই প্রভাবে আজীবন ইনট্রোভার্ট বলেন্দ্রনাথের অবস্থাও একই রকম। পরিবেশ এবং কারণ ভিন্নতর হলেও বন্ধন ও বেদনাবোধের প্রকৃতি ছিল অভিন্ন।

কিন্তু এই সাদৃশ্যের মধ্যেও স্বাতন্ত্র্যের বীজ প্রথম থেকেই নিহিত ছিল বলেন্দ্রনাথের মানস প্রকৃতি ও শিক্ষার বৈশিষ্ট্যে। বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের শিল্পি ব্যক্তিত্ব নিঃসঙ্গ অনুভবে এক হলেও মনের মূলগত স্বভাব এবং অধ্যয়ন অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্যে পরস্পর পৃথক। রবীন্দ্রনাথের মনের ধর্মটি প্রথম থেকেই বিশ্বাগ্রহী। তার প্রমাণ তাঁর আদ্যন্ত রচনাধারা। রবীন্দ্রনাথের লিপি নির্ভর বিদ্যাচর্চায় প্রথম ভূমিকা তৈরি হয়েছিল সংস্কৃত-বহুল বাংলা পাঠের মধ্যে দিয়ে। পরবর্তীকালে ব্যাকরণসর্বস্ব সংস্কৃত কিংবা ইংরেজি ভাষার অধ্যয়নে অনীহা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের পাঠ নেবার জন্য কবির শিশু মনে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল। পরিপূর্ণভাবে তিনি পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে হিমালয়ে বাসকালে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। তাই বলা যায় সূচনাকাল থেকেই রবীন্দ্র ব্যক্তিত্ব প্রাচ্য-প্রতীচ্য নির্বিশেষে বিশ্ববিদ্যা কৌতূহলী যে ছিল তার প্রমাণ প্রবন্ধগুলিতেই স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে বলেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে বাল্যশিক্ষা তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং মানসিকতা গঠনে সাহায্য করেছে। এ সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথের সংস্কৃত বিদ্যার প্রতি আবাল্য অনুশীলনের অনুকূল প্রভাবের কথা নানাভাবে ইঙ্গিত ও উল্লেখ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উনিশ শতকে বাংলা দেশের নবজাগরণ মুখ্যতঃ ছিল নগর কেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথ পদ্মাপারের জীবন অভিজ্ঞতার সূত্রে গ্রামীণ জীবনকে গেঁথেছিলেন তাঁর গল্প-কবিতার মালাতে। গ্রাম্য সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষিত মনের আগ্রহ যে বেড়েছিল তা একান্তই রবীন্দ্রনাথের দান। বলেন্দ্রনাথেরও শিল্পী মন তাঁর সৃষ্টির অব্যবহিত প্রেরণা লাভ করেছিল গ্রামীণ পরিবেশে সিক্ত গ্রাম্য কবিতার প্রত্যক্ষ আন্তরিকতা গভীর তলদেশ থেকে। এখানেই তাঁর ঘরোয়া প্রবণতার সহজ স্ফূর্তি। পরিণত বয়সের রচনায় দেখা যায় সংস্কৃত কাব্যকলা, বাংলাসাহিত্য, ভারতীয় চারুশিল্পের প্রতি তাঁর রসদৃষ্টি সবই আন্তরিকতায় উদ্বোধিত হয়েছে সন্তর্পন গৃহাতুরতায়। এ প্রসঙ্গে মনে আসতে পারে ‘পেনেটির বাগান বাড়ি’ সম্পর্কে

'জীবন স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথের শৈশবের অনুভবের প্রসঙ্গ। মানুষের সঙ্গ থেকে প্রত্যাখ্যাত কবি গানের প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে মানস শুশ্রূষার কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাকেই আপন সৃজনকর্মের একমাত্র আলম্বন শক্তিরূপে গ্রহণ করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে ভূদেব চৌধুরী যথার্থই বলেছেন—

> ''গদ্য লেখক রবীন্দ্রনাথ এবং বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে স্বাতন্ত্র্যজনিত প্রথম পার্থক্য এইখানে— প্রথমাবধি রবীন্দ্রমনের আগ্রহ বিশ্বাভিমুখী, উদ্দীপনা বিশ্বভাবনাশ্রয়ী;— বলেন্দ্রনাথ আদ্যন্ত গৃহবলিভুক্;—ঘরোয়া।—রবীন্দ্র প্রতিভা পৌরুষপ্রদীপ্ত; বলেন্দ্র প্রকৃতি নারী সুলভ সন্তর্পণতায় স্নিগ্ধ এবং মন্থর রচনার বিষয় নির্বাচন ও বিন্যাসে এই স্বভাব-স্বাতন্ত্র্যই নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে।"[১৪]

বলেন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত রচনা 'একরাত্রি' এবং তারপরে আরো ৮টি লেখাই আত্মগতভাবে মগ্ন 'কথিকার' আকারে লেখা— যাকে একালের পরিভাষায় 'রম্যরচনা' বলা যায়। বলেন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' এবং 'চন্দ্রপুরের হাট' রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা'র আঙ্গিক ও ভঙ্গীকে মনে করিয়ে দেয়। বলেন্দ্রনাথ বর্ণনামূলক শিল্পী আর 'ঘাটের কথা' ও স্বভাবে বর্ণনামূলক। একরাত্রি 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১২৯২ জ্যৈষ্ঠসংখ্যা, আর 'ঘাটের কথা' প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৯১ কার্তিক সংখ্যা। আর প্রকরণের তারতম্য সত্ত্বেও 'ঘাটের কথা' আসলে ছোটগল্প নয়, 'কথিকা'ই। বলেন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' আর রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা'র ভাষার সাদৃশ্যটুকুও বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

> ''দিবাকর সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম লাভার্থে অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। পৃথিবী এখন তাঁহার তীব্র কটাক্ষপাতের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রার আয়োজন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। চন্দ্রমা একটু একটু করিয়া আপনার হাসি হাসি ঢল ঢল মুখখানি বাহির করিতেছেন, মেঘগুলি হিংসায় সেই মধুমাখা মুখখানি আপনাদের কালো কালো কাপড় দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে"[১৫]।

আবার,

> ''ভরাগঙ্গা। আমার চারিটি ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে। জলের সঙ্গে স্থলের যেন গলাগলি।... জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙার বাবলা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে— দুরন্ত যৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুইপাশে ছলছল আঘাত করিতেছে— তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে সাড়া দিয়া যাইতেছে।''[১৬]

দুটি রচনার মধ্যে বিষয় কল্পনা ও বিন্যাসে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, 'ঘাটের কথা'য় প্রকৃতিপ্রেমিক কবি মনের আত্মকথা শেষ পর্যন্ত একটি গল্পরূপের শিথিল সম্ভাবনায় বাঁধা পড়লেও বলেন্দ্রনাথের বর্ণনা প্রথম থেকেই আত্মকথন মূলক।

কেউ কেউ বলেন যে বলেন্দ্রনাথ প্রবন্ধে যতটা শক্তিশালী কবিতায় ততটা নয়। কিন্তু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধানত গদ্যশিল্পী বলে পরিচিত হলেও তাঁর কবিতার সংখ্যাও কম নয়। বলেন্দ্রনাথের জীবৎকালেই দু'খানি কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল— 'মাধবিকা' (১৮৯৬), এবং শ্রাবণী (১৮৯৭)। বলেন্দ্রনাথের কবিতায় তিনি কোনো তত্ত্ব বা জীবন গভীরতার পরিচয় দিতে পারেননি, সংস্কৃত কাব্য রীতির আদর্শে কবিতার প্রসাধন করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গী ছিল উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রকাশরীতি অভিনব, সৌন্দর্য অভাবিতপূর্ব। 'ভারতী' এবং 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে' যেসব কবিরা রবীন্দ্র অনুগামী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বলেন্দ্রনাথ তাঁদের পূর্ববর্তী। রবীন্দ্রযুগের সূচনায় বলেন্দ্রনাথই ছিলেন ভোরের শুকতারা।

বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ এবং তাঁর রচিত কবিতা পড়লে কবিপ্রাণতার স্পর্শ দু'য় ক্ষেত্রেই যেমন মেলে তেমনি গদ্যে বলেন্দ্রনাথ ছিলেন বিষণ্ণ শান্ত, কবিতায় তিনি প্রসন্ন চপল। বলেন্দ্রনাথ গদ্যরচনা করতে গিয়ে যুক্তিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, প্রমাণ-দৃষ্টান্ত দিয়ে সুস্পষ্ট কোন তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। তাই তাঁর বিষয় বিচিত্ররকমের হলেও কোনোটাই তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিকপদ্ধতিতে আলোচিত হয়নি। বরং সবকিছুর মধ্যে বর্তমান নিবিড় ভাবগভীরতা। তাই তাঁর ব্যক্তিগত প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন বিষয় কল্পনা নয়। কবিমন

এই ব্যক্তিগত প্রবন্ধের গদ্যরচনাগুলিতে স্বাভাবিকভাবে পরিস্ফুট। কল্পনাশক্তি বলেন্দ্রনাথের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল বলেই 'সন্ধ্যার' বর্ণনা এত মনোরম হয়েছে।—

> ''সন্ধ্যা একাকিনী বসিয়া। শিথিল কেশপাশ কপোল বাহিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। আলুথালু কেশগুচ্ছের মধ্য হইতে সন্ধ্যাতারা অস্পষ্ট দেখা যায়— অতি ক্ষীণ, মিটিমিটি, জগৎ সন্ধ্যার কোলের নিকট সরিয়া আসিয়া বসে। মৃদু শান্ত হাসি হাসিয়া সন্ধ্যা তাহাকে স্নেহ দেয়। সে সুগভীর স্নেহাকর্ষণে জগৎ আর বাহিরে যাইতে পারে না।''[১৭]

এই বর্ণনায় সন্ধ্যা প্রকৃতির শুধু বহিরঙ্গ রূপই নয়, পুত্র স্নেহে আকুলজননী হৃদয় তার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে, সর্বোপরি এক 'মানবীরূপ' ধরা পড়েছে।

সন্ধ্যাসঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা' কবিতাই যেন এরই ছন্দোবদ্ধ রূপ হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রকাব্যে 'সন্ধ্যা' বিভিন্নভাবে, বিভিন্নরূপে দেখা দিয়েছে। যেমন— কখনো বধূবেশে, কখনো জননীরূপে, কখনো বৈরাগিনীর গৈরিকবসনে। প্রকৃতি রবীন্দ্রকাব্যে তখন জড়বস্তু নয়, কবির দৃষ্টিতে সে চিন্ময়ী। বলেন্দ্রনাথের চোখে বিলীয়মান সন্ধ্যার বর্ণনা আরো মর্মস্পর্শী—

> ''সন্ধ্যা যায়— আলোকধৌত রজত রাজপথ দিয়া একাকিনী চলিয়া যায়। চঞ্চল কোমল চরণ দু'খানি ভূমি ছোঁয়া কিনা ছোঁয়। পথে যায় যায়, এক একবার পশ্চাতে ফিরিয়া যায়। সেকি আর সাধ করিয়া যায়? সে না যাইলে সুরকাননে ফুল আর ফুটিবে না। সৌরভ ছুটিবে না। তাহাকে না দেখিলে ঊষার চিরবিকশিত কচি মুখখানি চিরদিনের তরে ম্লান হইয়া থাকিবে। ঊষা আর ফুল কুড়াইতে আসিবে না। তাই সন্ধ্যা যায়-গিয়াই সে ঊষার শুভ্র কপোলদেশে চুম্বন করে। শুভ্র ঊষা আরো শুভ্র হইয়া ওঠে।''[১৮]

এই বর্ণনা থেকে মনে হয় এ যেন গদ্যে লেখা কবিতা। আগেই বলেছি যে বলেন্দ্রনাথের রচনার উদ্দেশ্য যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা নয়। বস্তুর অভ্যন্তরে প্রাণকে স্পন্দিত করে তোলা। বস্তুপুঞ্জের মধ্যে নিদ্রিতা থাকে প্রাণ কন্যা— বলেন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনার স্পর্শে সেই নিদ্রিতাকে

জাগিয়ে দেয়। তাই ইতিহাসের তথ্যস্তূপের ভেতর জাতির প্রাণস্পন্দন লক্ষ করা যায়। 'কোণারক' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের ভাষায় নির্জনতাই এই প্রবন্ধে প্রাণ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সমিল প্রবহমান ছন্দ সেকালের কবিদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথই প্রথম অনুসরণ করেছিলেন। যেমন— 'মাধবিকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'অগ্নিহোত্র' কবিতাটি তা প্রমাণ—

পড়েছে কি মনে
কোন পুরাণের কাহিনী সরস্বতী তীরে
যবে ঋষিকন্যাগণ চারি ধারে ঘিরে
গুঞ্জন করিত বসি মৃদু মৃদু স্বরে
দিবসের দুঃখ সুখ যত, মৌনভরে
শুনিত একান্তচিতে কথা অভিনব
ঋষিসুখে;...।"[১৯]

এখানে তিনি মধুসূদনের আদর্শে প্রবহমান ছন্দ সৃষ্টি করেননি কারণ এতে অসমমাত্রার যতি নেই। এখানেও তিনি রবীন্দ্র অনুসারী। যদিও কবিতার ক্ষেত্রে অনেকাংশেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন। যেমন— শব্দচিত্রের প্রয়োগে। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শব্দচিত্র ছিল 'সোনা', সুবর্ণ, অথবা 'কনক'। বলেন্দ্রনাথও এই তিনটি শব্দচিত্র বার বার ব্যবহার করেছেন আপন কাব্যে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"সোনার কঙ্কণ দুটি বহিতেছে দেহে"[২০]

বা

"আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি"[২১]

বলেন্দ্রনাথও লিখছেন অনুরূপ ভাবে। অর্থাৎ সরাসরি রবীন্দ্র শব্দচিত্রকে অনুকরণ করেছেন কবিতায়—

'সোনার অঞ্চলখানি ভূমিতল পরে'[২১]

বা

'আতপ্ত যৌবন তবতপ্ত স্বর্ণস্রোতে।'[২৩]

উভয়ের শব্দচয়নভঙ্গি লক্ষ করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় কালিদাস ও জয়দেব থেকেই

তাঁরা শব্দ নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মত কবিপ্রতিভা বলেন্দ্রনাথের না থাকলেও বিশিষ্ট কল্পনা ভঙ্গি যে তাঁর কবিতাতে বর্তমান তা বলা যায়।

বলেন্দ্রনাথের সনেটগুলি ভাবে ও ভঙ্গিতে 'চৈতালি'র কবিতাগুলিকে স্মরণ করায়। 'শ্রাবণী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'অপরাহ্ন' সনেটটির কথা মনে পড়ে—

> ''আবার বাঁধিনু তরী আর ঘাটে এসে
> ঝিকিমিকি বেলাটুকু উপনীত শেষে।
> কলস লইয়া কাঁখে গ্রামবধূজন
> গ্রামপথে হেলেদুলে করিছে গমন।
> দুইধারে শস্যক্ষেত্র লুটায় চরণে,
> ফুলরেণু উড়ি আসি লাগিছে বদনে।''[২৪]

এই নদীতীরের বর্ণনা, গ্রাম্যবধূর কলসি নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা সবই 'চৈতালী' কাব্যের কল্পনাভঙ্গিরই অনুরূপ। তাই বলা যায় যে বলেন্দ্রনাথের কবিতায় রবীন্দ্রীয় অনুকরণ ছাড়িয়ে তখনও স্বতন্ত্র একক মহিমা গড়ে ওঠে নি। কিন্তু বলেন্দ্রনাথকে স্মরণের ক্ষেত্রে শুধু গদ্যেরই দান নেই, কবিতারও দান আছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

মৃত্যুর আগে বলেন্দ্রনাথ 'প্রদীপ' পত্রিকার জন্য যে প্রবন্ধ লেখার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন সেই প্রবন্ধটি তাঁর মৃত্যুর কারণে অসমাপ্ত থেকে যায়। সেই অসম্পূর্ণ 'শিবসুন্দর' প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করে 'প্রদীপ' পত্রিকায় আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় বের করেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে বলেন্দ্রনাথ যে খুবই মেনে চলতেন তার প্রমাণ মেলে রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তিতে। তিনি জানিয়েছেন—

> ''বলেন্দ্রনাথ কোন রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার বিষয় প্রসঙ্গ লইয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন। 'প্রদীপে'র জন্য যে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার বিষয়টিও আমার অগোচর ছিল না। তাহা ছাড়া নিজের স্মরণার্থ সঙ্কলিত প্রবন্ধের ভাবসূচনাগুলি তিনি স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে সংক্ষেপে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন।''[২৫]

এই মন্তব্য থেকে একটা কথা বোঝা যায় যে, বলেন্দ্রনাথ প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচনে বা বিষয় ভাবনাতে একান্ত তার নিজস্ব মতামতকেই গুরুত্ব দিতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করতে বসলেও পরিকল্পনা ও বিন্যাসে নিজস্ব ভাবনার দ্বারাই পরিচালিত হতেন। যদিও একথা সত্য যে রচনার মান উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী ভূমিকা নিতেন। এরও প্রমাণ মেলে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্য স্মৃতিচারণে—

> ''বলুদাদার যখনই কোন প্রবন্ধ লেখা শেষ হত বাবাকে দেখাতে নিয়ে আসতেন। ভাব ও ভাষা দু'দিক থেকেই তন্নতন্ন করে বিচার করে বাবা তাঁকে বুঝিয়ে দিতেন কি করে বিষয়টি লিখতে হবে। বলুদাদা পুনরায় লিখে নিয়ে এলে যে দোষত্রুটি বাবার তখনো চোখে পড়ত সেগুলি সংশোধন করে নিয়ে আসতে বলতেন। যতক্ষণ না মনঃপুত হত, বাবা ছাড়তেন না, বলুদাদাও অসীম ধৈর্য্য সহকারে লেখাটি বার বার অদলবদল করে নিয়ে আসতেন। এই রকম কঠোর শিক্ষার ফলে বলুদাদার লেখার মধ্যে ভাব ও ভাষার আশ্চর্য বাঁধুনি দেখ্‌তে পাওয়া যায়— না আছে একটু অতিরঞ্জন, না আছে অন্যাবশ্যক একটি কথা।''[২৬]

আগেই উল্লেখ করেছি যে, ঠাকুরবাড়ির বিপুল জনসমাগমের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ও নীতীন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের কতখানি প্রিয় পাত্র ছিলেন তার পরিচয় মেলে স্মৃতিচারণে, দৈনন্দিন তথ্যে ও চিঠিপত্রে। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের বাল্যবয়সের আদর্শপুরুষ ছিলেন বলেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কন্যা মাধুরীলতারও প্রিয় দাদা ছিলেন বলেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে থাকতেন তখন প্রায় সময়ই বলেন্দ্রনাথ ও নীতীন্দ্রনাথ সেখানে বেড়াতে যেতেন। শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের সন্তানদের কাছেই বলেন্দ্রনাথ ও নীতীন্দ্রনাথ প্রিয় ছিলেন না, প্রিয় ছিলেন রবীন্দ্রপত্নী মৃণালিনী দেবীর কাছেও। বয়সের পার্থক্য ছিল খুব কম বলেই তাঁর কাকিমার এত স্নেহভাজন ছিলেন। কাকিমাও তাঁদের পুত্রবৎ দেখতেন। ঠাকুর বাড়ির এই একে-অপরের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কটিও তাঁদেরকে রচনা লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের গদ্য স্বভাবের পার্থক্য তাই বর্তমান। তাই রবীন্দ্রভাষায় যে বল বর্তমান, যে বেগ উপস্থিত, যে বৈচিত্র্যমুখিতা লক্ষণীয় বলেন্দ্রনাথের ভাষায় সেই সকল না থাকলেও তাঁর স্থিরতা

ও দৃঢ়তা ও স্বচ্ছতা তাঁর রচনাকে কাব্যের সীমানায় বেঁধে দিয়েছে। তাই 'কণারক' প্রবন্ধের সঙ্গে 'মন্দির' কিংবা 'শুভ উৎসব' এর সঙ্গে 'উৎসবের দিন' এর ভাষারীতির বিভিন্নতা এই পার্থক্যকেই সমর্থন করে।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের ব্যবসা-বাণিজ্যের বহুমুখী উদ্যম, পিতামহ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মসাধনা ও পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনা বলেন্দ্রনাথকে এক নতুনজীবনের পথে নিয়ে গিয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'WORKS WILL WIN" বা কর্মের জয় নিশ্চিত' এই সংকল্পবাক্যকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে বলেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। কর্মব্রতে বলেন্দ্রনাথও ছিলেন অনুপ্রাণিত।

সাহিত্যিক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়ির অন্য সদস্যদের মতই সাফল্য লাভ করলেও শুধুমাত্র তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়টুকুই জীবিত আছে তা নয়, সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে একাধিককর্ম প্রচেষ্টাও তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য অবদান হিসাবে স্মরণীয়। যদিও সাহিত্যিক বলেন্দ্রনাথ আর কর্মী বলেন্দ্রনাথ এক নয়, তবুও বলেন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর কর্মজীবনকেও উপেক্ষা করা যায় না। কর্মী বলেন্দ্রনাথ ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা ও ধর্ম সংক্রান্ত সমন্বয় প্রচেষ্টা এই দু'য় বিষয়কেই করায়ত্ত করতে পেরেছিলেন বলেই কর্মী হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে।

ঠাকুরবাড়িতে ব্যবসাবাণিজ্য কোন সাড়া জাগানোর মত ঘটনা নয়। ঠাকুর পরিবার যে বিশাল ঐশ্বর্যের মালিক ছিলেন তার পিছনে বলেন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের অবদান অপরিসীম ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্যবসাবাণিজ্যলব্ধ আয় থেকে যে জমিদারী রেখেযান দেবেন্দ্রনাথের পর আর তার কোন বৃদ্ধি ঘটেনি। কিন্তু ঠাকুর পরিবারের সদস্য সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এই ব্যবসাবাণিজ্য সম্প্রসারণ খুবই দরকার হয়ে পড়ে। ১৮৯০ সালে বলেন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে পারিবারিক খাতা নিজের আত্মসমালোচনামূলক ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নিজেদের দাঁড়াবার আগ্রহ দরকার। অর্থাৎ এখানে বলেন্দ্রনাথের ব্যবসায়িক উদ্যমের দিকটি চোখে পড়ে। সেইসঙ্গে তাঁর স্বাদেশিক চেতনার কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঠাকুরবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৩৭ সালে

হিন্দুমেলার প্রবর্তন হয়। আর এই মেলার জন্যই স্বদেশী শিল্পের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। বলেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতই কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতি ছিলেন কারণ তিনিও মনে করতেন যে পরাধীন দেশের দুঃখ দারিদ্র হ্রাস করার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বলেন্দ্রনাথের অভিভাবক। তাঁর সান্নিধ্য, উৎসাহ, সহযোগিতা সবকিছুই বলেন্দ্রনাথকে এই সাধু সংকল্পে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও চাইতেন যে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা মোচনের জন্য দেশের শিল্পোন্নতির সাহায্য দরকার। তাই তিনি স্বদেশী শিল্পের অধিকতর উন্নতি এবং দেশীয় উদ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য দেশের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বহুবার। আর রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশচেতনার আদর্শটি ঠাকুরবাড়ির অন্য সদস্যদের মধ্যে অনুসৃত হতে থাকে। বলেন্দ্রনাথ সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিকল্পনা করেছিলেন স্বদেশী জিনিসের ব্যবহার বাড়িয়ে দেশের কুটির শিল্পের উন্নতির প্রসার ঘটাতে হবে। ফলে কাকা রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বলেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ সকলেমিলে ১৮৯৯ হ্যারিসন রোডে 'স্বদেশী ভান্ডার' খুলে বসলেন অবনীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ''বলু খুব খেটেছিল— নানাদেশ ঘুরে যেখানে যা স্বদেশী জিনিস পাওয়া যায়— মার পায়ের আলতা থেকে মেয়েদের পায়ের জুতো সবকিছু জোগাড় করেছিল, তার ঐ শখ ছিল।''[২৭]

যদিও বলেন্দ্রনাথের বাণিজ্যিক প্রচেষ্টা স্বদেশী ভান্ডার উন্মোচন করার আগেই লক্ষ্য করা যায়। ১৮৯৫ খ্রীঃ বলেন্দ্রনাথ শিলাইদহের কাছে কুষ্ঠিয়া শহরে, সুরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে 'Tagore & Co.' নামে একটি কারবারের সূত্রপাত করেন। মফস্বল থেকে পাট ও ভূষিমাল কিনে গাঁট বেঁধে ও বস্তাবন্দী করে রপ্তানি করা হতো কলকাতায়। ফলে ব্যবসায়িক লাভের অঙ্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় Renweek নামে এক ইংরেজ কোম্পানীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ নেমে পড়েন। Renweek কোম্পানি আখমাড়াই এর কলগুলি গ্রামাঞ্চলে ভাড়া খাটিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে থাকে দেখে বলেন্দ্রনাথ এই ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করেন এবং সাফল্য লাভ করেন। ফলে কোম্পানির আর্থিক অবস্থার আরো উন্নতি ঘটতে থাকে। এই সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পাট ব্যবসাতে প্রচুর সুনাম অর্জন করতে থাকেন। ফলে রবীন্দ্রনাথকে ভ্রাতষ্পুত্রদের ব্যবসার উন্নতি আকৃষ্ট যেমন

করতে থাকে তেমনি তাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ ও পরামর্শও দিতে থাকেন।

পরবর্তীকালে এই ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার সমস্ত ভার বলেন্দ্রনাথের উপর এসে পড়েছিল। কিন্তু আদর্শবাদী, সাহিত্যিক বলেন্দ্রনাথের পক্ষে ব্যবসার খুঁটিনাটি রপ্তকরা সম্ভব হয়নি বলেই তিনি কোম্পানির ম্যানেজারের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু কুচক্রী ম্যানেজার যখন বলেন্দ্রনাথের অখণ্ড বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে কোম্পানীকে দেউলিয়া করতে থাকেন তখনই রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে বলেন্দ্রনাথ কোম্পানীর সমস্ত দায়িত্ব যজ্ঞেশ্বর নামে এক অধস্তন কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু পূর্বে কোম্পানীর যে রমরমা অবস্থা ছিল পরবর্তীকালে তা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যায় নি। সুরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত কর্মব্যস্ততা ও বলেন্দ্রনাথের পাঞ্জাব গমন (পাঞ্জাবী আর্য সমাজ ও বাঙালী আর্য সমাজের মিলনার্থে) এবং দেশে ফিরে অকালপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথের উপর কোম্পানির সবদায়িত্ব এসে পড়ে। একদিকে প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুশোক অন্যদিকে কোম্পানীর অর্থনৈতিক গরমিল কবির মনকে নানাভাবে ভারাক্রান্ত করে তোলে, পরে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে চলে আসেন তখন যজ্ঞেশ্বরকে ৩ হাজার টাকা ও নামমাত্র বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে সমস্ত ব্যবসাটি দান করে দেন।

যে স্বদেশের মঙ্গলার্থে, হিতসাধনের মহান উদ্দেশ্যে বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যবসার পত্তন করেছিলেন সেই ব্যবসা একদিন তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে খুবই মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে—

> "পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবি অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারংবার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে পলি রাখিয়াচলে তাহাতেই দেশের মাটিকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে— তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকেনা বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহার ক্ষতি বহন করিয়াই আসিয়াছেন, মৃত্যুর পরবর্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।"[২৮]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বলেন্দ্রনাথের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

বলেন্দ্রনাথের ধর্ম সমন্বয় প্রচেষ্টা কতটা আন্তরিক ছিল তা ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য সমাজের সমন্বয়ের মধ্যে একটি নিখিল ভারতীয় ধর্ম সম্প্রদায় গঠনের প্রচেষ্টাতেই প্রমাণিত। উনিশ শতকে ভারতবর্ষের ধর্ম আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য সমাজ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বলেন্দ্রনাথ এই দু'য় সমাজের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে যে উদারতা দেখিয়েছেন তা অতুলনীয়। ঠাকুরবাড়ি এই দু'য় সমাজের মিলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন রামমোহনের ভাবশিষ্য। তিনি দ্বৈততত্ত্বকে স্বীকার করেন বলেই অবতারবাদকে মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন যখন ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন তখন তাঁকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মদের মধ্যেই অবতারবাদের প্রাবল্য দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সমর্থকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, ফলস্বরূপ ১৮৬৮ খ্রীঃ ব্রাহ্ম সমাজ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে' নতুন সমাজের নেতৃত্ব দেন। মহর্ষি এই ঘটনায় মানসিকভাবে বিদ্ধ হন; এরকম পরিস্থিতিতে ১৮৭৭ আর্য সমাজের উদ্ভব হয় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর হাত ধরে। দয়ানন্দের লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় ঐক্য সাধনার সাহায্যে জাতীয় ঐক্য সংস্থাপন। তাই তিনি হিন্দুদের সামনে বেদকেই আদর্শ ধর্মগ্রন্থরূপে উপস্থাপিত করতে থাকেন। দয়ানন্দ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হলেও অবতারবাদে আস্থা তাঁর ছিলনা। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই আর্যসমাজ সম্পর্কে মহর্ষির উৎসাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর তাই এই দুই সমাজের মিলন সাধনের সম্ভবনা নিয়ে নিজপুত্র ও পৌত্রদের মাধ্যমে আর্যসমাজীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করতে থাকেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আর্য সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শুরু করেন মহর্ষির পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরবর্তীকালে হেমেন্দ্রনাথের পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথও কিছুদিন পত্র বিনিময় করেছিলেন। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে শুধু ঠাকুর পরিবারে নয় সমগ্র বাংলাদেশেও বলেন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠকর্মী। তাঁর প্রমাণ মেলে তাঁর মা প্রফুল্লময়ী দেবীর বক্তব্যে—

> "পাঞ্জাবের আর্য সমাজের সহিত আমাদের ব্রাহ্ম সমাজের যাহাতে
> মিলন স্থাপন হয় সেইজন্য তাহার প্রাণের প্রবল ইচ্ছা ছিল এবং
> তাহারই জন্য বলু আর্য সমাজে যাতায়াত করিতে থাকে।"[২৯]

বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের মনীষীবৃন্দ তখন অনুভব করছিলেন যে জাতীয় ঐক্যের

বন্ধন সুদৃঢ় না হলে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি লাভের আশা নেই। এই ব্যাপারে দৃঢ় সূত্র হল ধর্ম। ঠাকুরবাড়ির সন্তান হিসাবে বলেন্দ্রনাথ ও এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এই সময় 'সাধনা' পত্রিকাতে বলেন্দ্রনাথ লিখছেন—

> ''হিন্দুধর্ম একটা প্রকাণ্ড নিবিড় জঙ্গল-যেখানে যেমন সুবিধা পাইয়াছে নানারকমের গাছপালা এবং আগাছা সমভাবে গজাইয়া উঠিয়াছে। গাছে আগাছায় বন ঢাকা— কোথাও পথ দেখা যায়না— এবং এতদিন পথের সন্ধান কেহ করে নাই— ঘন বনের মধ্য দিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া আর কত পথ বাহির হইবে? এখন ইংরাজী শিক্ষার প্রসঙ্গে আমাদের মনে যে নূতন স্বাধীনতা ও সংহত ঐক্যের ভাব আসিয়াছে ইহা দ্বারাই যদি কালে বিপুল ধর্মজঙ্গল পরিষ্কার হয়— এবং এই ঘন নিবিড় বনানীর মধ্য দিয়া কোন নূতন পথ বাহির হয় সেই একমাত্র ভরসা।''[৩০]

বলেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র দুটি সমাজের মিলনের জন্য নয়, সমন্বয়ের সূত্রে সমগ্র ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে ধর্মনৈতিক ঐক্যস্থাপনই বলেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্যই তিনি ১৮৯৭ সালে পাঞ্জাব, বোম্বাই গিয়ে আর্য সমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এর পরের বছরই ১৮৯৮ সালে রথীন্দ্রনাথের উপনয়নের ব্যবস্থা করেন শান্তিনিকেতনে- যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের আমন্ত্রণ করে ঐক্যসাধন প্রচেষ্টার একটি সর্বজন গ্রাহ্য মীমাংসা বিধান করা যায়। এরপর বিভিন্নভাবে বলেন্দ্রনাথ আর্য সমাজও ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কিত আলোচনাতে মগ্ন হতে থাকেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল সামান্য কয়েকটি বৈষম্যের কথা ভুলে গিয়ে ধর্মীয় ঐক্য সাধনে দ্বারা জাতীয় সংহতি রক্ষা করা। আর তাই ১৮৯৮ খ্রীঃ ২৯ শে নভেম্বর লাহোর ব্রাহ্মসমাজে বলেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে আর্য ও ব্রাহ্ম সমাজীদের একটি মিলিত ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে সকলেই মুগ্ধ হন এবং পুনরায় মিলিত হবার আশা প্রকাশ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বলেন্দ্রনাথের এই সাধু উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত বিফলে পরিণত হয়। তবুও বলেন্দ্রনাথ একেবারে আশা ছাড়েন নি। কারণ তিনি উপলব্ধি করলেন যে এতদিনের বদ্ধমূল ধারণাগুলি রাতারাতি পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না তারজন্য দরকার দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের উপর ভরসা রাখা। শৈশব থেকেই যুবসমাজ যাতে কুসংস্কার মুক্ত ও যুক্তিবাদী মনোভাবাপন্ন হয়ে

উঠতে পারে সেই চেষ্টা করার উদোগ নিতে হবে। এর জন্য দরকার শিক্ষাক্ষেত্র। বলেন্দ্রনাথ এরকমই পরিকল্পনা করার উদ্যোগ নেন। তাই তিনি বেছে নিলেন শান্তিনিকেতনকে। শান্তিনিকেতনের নির্জন পরিবেশে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করে প্রাচীন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শে ছাত্রদের শিক্ষিত করে তোলার পরিকল্পনা নেন এবং মহর্ষির সমর্থনে শান্তিনিকেতনে একতলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন— যা বর্তমানে বিশ্বভারতীর প্রধান গ্রন্থাগারের অন্তর্গত সামনের ঘর ও বারান্দা। বলেন্দ্রনাথ অনেকগুলি নিয়মাবলীর খসড়া তৈরি করেন যাতে তাঁর গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। বলেন্দ্রনাথ তাঁর পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের যে নিয়মাবলীর খসড়া করেছিলেন সেগুলি হল নিম্নরূপ—

‘‘(১) শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী করিয়া অধ্যাপনা করা হইবে।

(২) বিদ্যালয় ছয় শ্রেণীতে হইবে।

(৩) আপাততঃ দশজনমাত্র ছাত্র বিনাব্যয়ে বিদ্যালয়ে থাকিয়া আহার ও শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।

(৪) আহার্যের ব্যয়স্বরূপ মাসিক ১০্ দিলে আরও ২০ জন ছাত্রকে বিদ্যালয়ে পাওয়া যাইতে পারিবে।

(৫) শান্তিকেতনের আশ্রমের ট্রাষ্টীগণ ব্যতীত আরও চারজন সভ্যকে লইয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমিতি গঠিত হইবে। প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচনে আশ্রমের ট্রাষ্ট্রীগণের কর্তৃত্ব থাকিবে। তৎপরে কোনো অধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে অবশিষ্ট অধ্যক্ষরা মিলিয়া অধ্যক্ষ নির্বাচন করিয়া লইবেন।

(৬) অধ্যক্ষ সমিতি ব্রাহ্ম ধর্মানুমোদিত শিক্ষাপ্রণালী এবং শান্তিনিকেতনের নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করিবেন।

(৭) শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রাষ্টীগণের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক হইবেন। সম্পাদক অধ্যক্ষসভার অনুমতি লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিদর্শন, হিসাব পরীক্ষা ও কর্মচারী নিয়োগ ও পরিবর্তন, ছাত্র নির্বাচন, পুস্তক এবং শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

(৮) বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠ্যগ্রন্থের সঙ্গে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে (ক্লাস ৮) ‘পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম’ এবং চতুর্থ বার্ষিক হইতে প্রবেশিকা পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম ও ব্যাখ্যান অধ্যাপনা হইবে।

(৯) তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী হইতে এনট্রান্স পর্যন্ত সমুদয় ছাত্র অধ্যাপকসহ আশ্রমের প্রতি সায়ং উপাসনায় যোগ দিবে এবং নিম্নশ্রেণীর বালকগণকে লইয়া অধ্যাপকগণ স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট উপাসনা করিবেন।

(১০) সকল ছাত্রকেই বিদ্যালয় ভবনে বাস করিতে হইবে। এবং শিক্ষকগণ তাহাদিগকে লইয়া নিরূপিত সময়ে একত্র আহারাদি করিবেন এবং যথাসম্ভব ছাত্রগণের সহিত ক্রীড়া কৌতূকেও যোগ দিবেন।

(১১) ছুটির সময় ব্যাতীত মাসে ৩ দিন ছাত্রগণ অভিভাবকদের সম্মতি থাকিলে অধ্যাপকের অনুমতি লইয়া বাড়ি যাইতে পারিবে।

(১২) অভিভাবকগণ প্রতি রবিবারে গিয়া বালকদিগকে দেখিয়া আসিতে পারিবেন।"[৩১]

যদি বলেন্দ্রনাথ অকালে মারা না যেতেন তা হলে আমরা রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনকে কি পেতাম বা কিরূপে পেতাম সেটা একটা বড় প্রশ্ন। হয়তো রবীন্দ্রনাথের কর্মপ্রবাহ অন্য পথে চরিতার্থ হত। কিন্তু এটি একবাক্যে স্বীকার করা যায় যে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনে প্রথম উদ্যোগী ছিলেন বলেন্দ্রনাথ। তাঁর অকালমৃত্যুজনিত শূন্যতা ও পরিত্যক্ত বিদ্যালয় প্রকল্পই রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আসন পাতার কারণ। ইতিহাসের এই বাস্তব সংবাদকে কোনমতেই অস্বীকার করে শান্তিনিকেতন গড়ে ওঠার কথা ভাবা যায় না। দেবেন্দ্রনাথের সংকল্পকে বাস্তবায়িত করতেই বলেন্দ্রনাথ একেশ্বরবাদী বটুদের শিক্ষার জন্য ব্রহ্ম-বিদ্যালয় করার পরিকল্পনা করেছিলেন। মহর্ষির জীবিতকালে সেখানে হিন্দু ছাড়া কোন ছাত্র নেওয়া হত না, খাবার পঙ্‌ক্তিতেও বর্ণবিচার চলত। মহর্ষির মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণ ভাবনা থেকে বিশ্বভাবনার মাধ্যমে পিতার সংকল্প ও ভাইপো বলেন্দ্রনাথের সম্পাদনা--- এই দুই পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছিলেন বলেই শান্তিনিকেতন একটি ধর্মপ্রচারক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ব প্রেক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত বিশ্বজ্ঞানের বিদ্যালয় করে তুলেছিলেন। বলেন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের তৎপরতা ছিল রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের নান্দীমুখ। শান্তিনিকেতনে শিক্ষার দীপশিখাটি প্রথম জ্বালাতে চেয়েছিলেন বলেন্দ্রনাথই।

বলেন্দ্রনাথ এমনই এক ব্যক্তি যিনি পরিকল্পনা শুরু করলেও নিয়তির অমোঘ নির্দেশে তা পূর্ণতা দিতে পারতেন না। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যে যুবসমাজের

উন্নতিকল্পে পরিকল্পনা করলেন সেই পরিকল্পনা তাঁর জীবদ্দশায় সাফল্য লাভ করল না কারণ ১৩০৬ সনে গুরুতর অসুস্থ হয়ে ঐ বছরই ভাদ্র মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ প্রিয় ভাইপোর ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাটি রূপায়ন করেন, ১৩০৮ সালে ৭ই পৌষ ব্রহ্মবিদ্যালয়কে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদ্বোধন করেন। বলেন্দ্রনাথের হাতে যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ভিত্তির কাজ শুরু হয়েছিল পরমপ্রিয় কাকা রবীন্দ্রনাথের বহু যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে তা আজকের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তাই সাহিত্যিক হয়েও বলেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত আগ্রহের বশে ভারতের ধর্মীয় ঐক্যস্থাপনের যে কর্ম করে গেছেন তা হয়তো মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা দয়ানন্দ সরস্বতীর মত না হলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যিক সত্তার সঙ্গে ধার্মিক ও কর্মযোগী সত্তার এই ত্রিবেণী সঙ্গম বলেন্দ্রনাথের মত একজন ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেই খুঁজে পাওয়া যায়। আর তাই এইরকম একজন প্রতিভাধরের জন্য তাঁর জননীও বেশ গর্ব অনুভব করতেন। আপন পুত্রের সম্পর্কে এত গভীর বিশ্লেষণ লেখক প্রতিভাকে যেন বহুগুণীত করে তুলেছিল। তাই প্রফুল্লময়ী দেবী পুত্রের অকালমৃত্যুতে বেদনার্ত হৃদয় নিয়েও বলতে পেরেছিলেন—

> ‘‘কুন্তীর মত বহু পুত্রের জননী হই নাই বটে কিন্তু যে পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম তাহা শতপুত্রের অপেক্ষাও কিছু কম বলিয়া মনে করি নাই। এ শুধু জননীর নিকট পুত্রের প্রশংসা নহে, পরিবারের সকলে এবং বাহিরের লোকেরা যাহারা তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন কোন পুত্রের জননী হইবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে। পাঞ্জাবের অধিবাসীরা, যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের মত ভালবাসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিতে পারেন যে অল্পদিনের মধ্যে কি বস্তুকে তাঁহারা হারাইয়াছিলেন।’’[৩২]

একথা সত্যিই যে শুধু পাঞ্জাববাসীরা নন, একবিংশ শতাব্দীর পাঠকও তাঁর অভাব আজ অনুভব করছে। আর এসব বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের পরিবেশ আর পাঁচটা সাধারণ বাড়ির সঙ্গে একইভাবে হয়তো তুলনীয় নয়। কারণ এ হল একান্নবর্তী বৃহৎ অভিজাত পরিবারের উনিশ শতকীয় চালচিত্র। আর এই পরিপ্রেক্ষিতকে বলেন্দ্রনাথ শিশু বয়স থেকে তার মজ্জার সহচর করে বেড়ে

উঠেছিলেন। তাই তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন ফেলে আসা অতীতের বর্ণময় শব্দকে সযত্নে কুড়িয়ে এনে। এজন্য বেশিরভাগ সময়ই তিনি সীমায়িত ছিলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরববাড়ির স্বতন্ত্র পরিবেশে।

তথ্যসূত্র

১। দেবী প্রফুল্লময়ী, 'আমাদের কথা', বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা), কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ২৭

২। তদেব, পৃ. ২১-২২

৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৯৬, পৃ. ৪১৩-৪১৪

৪। দেবী প্রফুল্লময়ী, 'আমাদের কথা', বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা), কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ২২

৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'ছিন্নপত্রাবলী', ৪নং পত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৪০৯; পৃ. ১৯

৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'বলাই', রবীন্দ্ররচনাবলী (দ্বাদশখণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৯৭, সুলভ সংস্করণ, পৃ. ৪০৬

৭। তদেব, পৃ. ৪০৬

৮। তদেব, পৃ. ৪০৬

৯। তদেব, পৃ. ৪০৬

১০। দেবী প্রফুল্লময়ী, 'আমাদের কথা', বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা), কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ২২

১১। তদেব, পৃ. ২৭

১২। তদেব; পৃ. ২৭-২৮

১৩। সেন প্রিয়নাথ, 'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর', বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা.), কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৭

১৪। চৌধুরী ভূদেব, 'বাংলা গদ্যে বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ', বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা.), কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৬৬

১৫। তদেব, পৃ. ৬৭।

১৬। তদেব, পৃ. ৬৭

১৭। দত্ত ভবতোষ, 'কবি ও শিল্পী বলেন্দ্রনাথ', বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা.), কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৯৪।

১৮। তদেব, পৃ. ৯৫

১৯। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, 'অগ্নিহোত্র', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ.

২০। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সোনারতরী, 'সোনার বাঁধন', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা ১৪০৮, পৃ. ৩১

২১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সোনারতরী, 'সোনারতরী', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৪০৮, পৃ. ১২

২২। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, 'অগ্নিহোত্র', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৬৬

২৩। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রগ্রন্থাবলী, 'আবাহন', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২; পৃ. ৭৫

২৪। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রগ্রন্থাবলী, 'অপরাহ্নে', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৭৫

২৫। চৌধুরী ভূদেব, 'বাংলা গদ্যে বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ', বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা.), কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৭২

২৬। ঠাকুর রথীন্দ্রনাথ, 'পিতৃস্মৃতি', জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৩৮৭, পৃ. ৫০

২৭। চন্দ রাণী, 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ', বিশ্বভারতী, ২য় সংস্করণ, ১৯৭২, পৃ. ১০

২৮। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', (নবম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৯৬, পৃ. ৫০৭

২৯। দেবী প্রফুল্লময়ী, 'আমাদের কথা', বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা), কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ২৯-৩০

৩০। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রগ্রন্থাবলী, 'ধর্ম্মজঙ্গল', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২; পৃ. ৪৫৯

৩১। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, 'রবীন্দ্রজীবনী' (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী, ১৩৯৫, পৃ. ৩৭-৩৮

৩২। দেবী প্রফুল্লময়ী, 'আমাদের কথা', বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা), কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়

দ্বিতীয় অধ্যায়

বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়

> ''যাঁরা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে— কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।''[১]

প্রাচীন ভারতবর্ষে জীবনের প্রারম্ভভাগে ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা নিয়মে সংযমে জীবন গঠনের কঠিন অভ্যাস ও ব্রত-পালন করতে হত। সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্তি সংযত করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন—

> 'সৌন্দর্য বোধ ঠিকমত উদ্‌বোধনের জন্য ব্রহ্মচর্যের সাধনই আবশ্যক।'[২]

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন সৌন্দর্য সাধক। তিনি তাঁর প্রবন্ধ ও কবিতার মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য সাধনা করেছেন। আমরা বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ নিয়ে আলোচনা করার আগে সাহিত্যে সৌন্দর্য অনুসন্ধানের ইতিবৃত্তটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো। আর এ প্রসঙ্গে প্রাচ্য সৌন্দর্য সাধক বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ যেমন আলোচনা করা হবে তেমনি পাশ্চাত্য সৌন্দর্য সাধকদেরও সৌন্দর্য সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে তা কতটা কার্যকরী হয়েছে তা তুলে ধরবো। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সৌন্দর্যতত্ত্বে' সৌন্দর্য সম্পর্কে বলেছেন—

> 'আর্টিস্ট সুন্দরকে অসুন্দরকে নিয়ে চিরকাল খেলা করেছে। নানামূর্তিতে নানা চিত্রে, নানা ছন্দে, নানা নৃত্যে, গানে তাঁরা সুন্দরকে ধরে আনছে সভার সামনে কিন্তু সৌন্দর্য সম্বন্ধে বলতে গেলে সব আগেই আর্টিস্টের মুখ হয়ে যায় বন্ধ।'[৩]

কারণ দার্শনিকের কাজ 'সৌন্দর্য' নিয়ে, আর্টিস্টের কাজ 'সুন্দর' নিয়ে। কিন্তু আর্টিস্টের মুখবন্ধ হয়ে গেলেও মনে হয় তা সাময়িক, যেহেতু দার্শনিকের মত আর্টিস্টদের অনেকেই

সৌন্দর্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন বহুকাল আগে থেকেই। উভয়েই জানতেন যে সৌন্দর্যের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন এবং তা সকলের সমমতাবলম্বী হওয়া অসম্ভব। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেছিলেন, সৌন্দর্য স্বর্গীয়। বস্তুজগতে ইন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতায় সুন্দরের অজাগতিক উজ্জ্বলতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বর্গীয় সুন্দর যথার্থ সুন্দর; পরমসুন্দর, বস্তু পৃথিবীতে তারই প্রতিফলন ঘটেছে এবং বস্তুজাগতিক সুন্দরকে সেই পরম সুন্দর নিজের দিকে আকর্ষণ করে। বস্তুজাগতিক সুন্দর বোঝাতে গিয়ে প্লেটো Symposium (207) গ্রন্থে বলেছেন— "deformed is always in harmonious with the divine, and the beautiful harmonious."[৪] অর্থাৎ স্বর্গীয় সুন্দরের সঙ্গে অসমঞ্জসকে প্লেটো বস্তুজাগতিক সুন্দর বলে গ্রহণ করতে সম্মত হননি। তাই একটি সুন্দর রূপের সঙ্গে অপর সুন্দর রূপের কোনো পার্থক্য খুঁজে না পাওয়ায় প্লেটোর কাছে সৌন্দর্য একটি নির্বস্তুক গুণমাত্রে পর্যবসিত হয়েছিল।

আবার অ্যারিস্টটলের কাছে 'সৌন্দর্য' নির্বস্তুক নয়। শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও স্পষ্টতা এই তিনটি সৌন্দর্যের প্রধান উপাদান। সৌন্দর্যকে অ্যারিস্টটল বাহ্যজ্ঞান ও মাপের সীমানায় এনে উপস্থিত করলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। প্লেটো-অ্যারিস্টটলের পরবর্তীকালে প্লোটিনিউস তাঁর ক্লাসিক্যাল পূর্বসূরি প্লেটোর কাছ থেকে সৌন্দর্য বিচারে অজাগতিকতা-তত্ত্বটুকু মাত্র গ্রহণ করে সৌন্দর্যদর্শনে কাব্যিক ঐশ্বর্যের নতুন স্পর্শ এনে ফেলেন তাঁর স্বতন্ত্র বিচার-ক্ষমতা প্রয়োগে। প্লোটোনিউসও সামঞ্জস্যে বিশ্বাসী, তবে অ্যারিস্টটলীয় সামঞ্জস্যে নয়। তাঁর মতে সামঞ্জস্য হচ্চে মহাজাগতিক সামঞ্জস্যের প্রতীক মাত্র। জগতে যা কিছু সুন্দর ও মঙ্গলময়, প্লোটিনিউস এর মতে, সবই এসেছে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের সঞ্চয় থেকে। প্রকৃত মঙ্গল ও সুন্দরের অধিষ্ঠান ভূমি সেই অলৌকিক স্বর্গলোক। পঞ্চদশ শতকের শেষপাদে ইতালীয় রেনেসাঁস লগ্নের নিও-প্লেটোনিক দার্শনিক মার্সিলিও ফিসিনো তাঁর 'দ্য আমোর' গ্রন্থে প্রেমানুভূতিকে সৌন্দর্যবোধের উৎস বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, প্রেমই অসুন্দরকে সুন্দর করে এবং প্রেমের উদ্বোধনেই মানুষ সুন্দর সম্পর্কে আকর্ষণ বোধ করে। ফিসিনো আরো বলেছেন, সৃষ্টির আদিম অবস্থায় ছিল বিশৃঙ্খলা, তারপর প্রেমের বিকাশে বিশৃঙ্খলায় আসে রূপ এবং মৃতের বুকে সঞ্চারিত হয় প্রাণ। প্রেম অন্তরকে উদ্বোধিত করে, সুন্দরও সেই একই কাজ করে। সুন্দরের অনুভূতি একান্তই আত্মিক।

অতএব একথা স্পষ্ট যে, প্লেটো জাগতিক সুন্দরকে স্বর্গীয় সুন্দরের প্রতিফলন বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অ্যারিস্টটল বাহ্য-শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যকে সুন্দরের হেতু বলে ঘোষণা করলেন। নিও-প্লেটোনিক বলে চিহ্নিত দার্শনিকেরা প্লেটোর পদ্ধতি অনুসারেই সুন্দরের স্বরূপ আলোচনা করলেন এবং বিদেহী আধ্যাত্মিক সুন্দরকে স্বর্গীয় সুন্দরের সঙ্গে একতানবদ্ধ ও আত্মার সৌন্দর্যের স্বরূপ সন্ধানে দার্শনিকেরা বাস্তবজগৎ ও বাস্তবাতীত ভাবজগৎ দুদিকেই তাঁদের বিশ্লেষণী দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন। তারপর থেকে কেউ সৌন্দর্যের বাস্তবরূপ কেউ বা সৌন্দর্যের একান্তই অনুভূতি গ্রাহ্য ভাবরূপ সন্ধান করেছেন।

ইংরেজ দার্শনিক শাফট্স্‌বেরী সমানুপাতিক ও সুসমঞ্জসকে সুন্দর বলে ঘোষণা করলেন অ্যারিস্টটলীয় পদ্ধতিতে। কিন্তু তারপরেই বললেন যে, যা সমানুপাতিক ও সুসমঞ্জস তাই সত্য। আবার যা সত্য ও সুন্দর তাই মঙ্গলদায়ক, ঈশ্বরই যাবতীয় সৌন্দর্যের স্রষ্টা। অ্যারিস্টটলীয় ও নিওপ্লেটোনিক বিশ্বাসের মিলন ঘটল শাফট্স্‌বেরীয় মন্তব্যে। পরবর্তীকালে ডারইউন ও ফ্রয়েড নিজস্ব ভঙ্গিতে এই ধারণার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। সুন্দরের বোধ শুধু মানুষের মধ্যেই নেই, পশুপাখির মধ্যেও আছে— ডারউইনের ধারণা অনুযায়ী। পাখির সুন্দর বাসা, সুন্দরগান এ সবই সুন্দর। সুন্দর বস্তুতে উদ্দেশ্যহীনতা থাকতে হবে এই ধারণার সঙ্গে ডারউইন একমত ছিলেন না। আর ফ্রয়েড তো শিল্পকর্মে শিল্পীর অপূর্ণ কামনার পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়ে শিল্প ও সৌন্দর্যের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যমূলকতা ঘোষণা করলেন বার্ক-এর রচনায় যে ধারণার সংকেত ছিল তা একজাতীয় চূড়ান্ত মতবাদের প্রারম্ভিক সূচনা। এই মতবাদের বিপরীত ধারণা পোষণ করতেন কান্ট। ইংরেজ দার্শনিক কেমসের মতো কান্ট সৌন্দর্যকে taste বা আস্বাদন নির্ভর অনুভূতিবিশেষ বলে উল্লেখ করেছেন এবং উভয়ই একমত যে সুন্দরবস্তু মাত্রই আনন্দদায়ক। কিন্তু কান্ট এই আনন্দকে বিশিষ্ট করে তুললেন, তাই তিনি মনে করেন সৌন্দর্য আনন্দদায়ক কিন্তু এই আনন্দ নির্লিপ্ত মনের আনন্দ। কান্ট যে ধারা প্রবর্তন করেন, সেই ধারায় শিলার পরে হার্বার্ট স্পেন্সারের মতবাদের বিকাশ। কান্টকে অনুসরণ করেই শিলার সৌন্দর্যকে ও শিল্পকে মানবাত্মার খেলা বা লীলা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সুন্দরের সঙ্গে মানুষ খেলা করে এবং তখন এই খেলা সম্ভব হয় যখন মানুষ পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ মানুষই শুধুমাত্র সুন্দরের সঙ্গে খেলা বা লীলা করে। শিলার মানবাত্মার খেলা করার

প্রবৃত্তির চরম উদ্দেশ্য সন্ধান করেছিলেন সৌন্দর্যের জগতে। যে খেলায় সৌন্দর্য মূল লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য ফললাভ, তাকে জুয়াখেলার পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।

শিলিং সুন্দরকে সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ বলে গ্রহণ করে বলেন, দক্ষতা বা জ্ঞানের দ্বারা শিল্পী সুন্দরকে মূর্তিদান করেন না। শিলিংএর মতো হেগেল সুন্দরকে সীমার মধ্যে অসীমের অভিব্যক্তি বলে গণ্য করেছেন। হেগেলের মতে, সৌন্দর্য হচ্ছে 'আইডিয়া'র সীমাশাসিত মূর্তি। প্রকৃতিতে সৌন্দর্য আছে, সৌন্দর্য আছে শিল্পেও। কিন্তু শিল্পের সৌন্দর্য হচ্ছে মনের মধ্যস্থতায় নবরূপ প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। হেগেল কান্টের মতো বলেননি যে, শিল্প প্রকৃতির অনুরূপ হলেই শিল্প সুন্দর হবে, তাঁর মতে শিল্পের উপাদান প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত হলেও শিল্পের সৌন্দর্য মনের সৃজন-ক্ষমতার সৃষ্টি। অতএব শিল্পের সৌন্দর্যই মহত্তর। শোপেনহাওয়ার সৌন্দর্যবোধকে এমন একটি শক্তি বলে অভিহিত করলেন, যার সাহায্যে মনের কামনার পুরোপুরি মোক্ষণ ঘটে। তিনি সুন্দরকে গ্রহণ করলেন কামনা বাসনাহীন বিশুদ্ধ আনন্দ সৃষ্টিক্ষম সত্য হিসাবে। অন্তরের বিশুদ্ধ একটি বাসনাহীন ধ্যানই রূপ নেয় শিল্পের তথা সৌন্দর্যের জগতে।

সৌন্দর্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দার্শনিকদের এই সমস্ত মতবাদ থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ে--- আসল সমস্যা ছিল এঁদের কাছে, সৌন্দর্য অজাগতিক, আধ্যাত্মিক, আস্বাদধর্মী? না, সুন্দরের অস্তিত্ব ও সর্তকতা বস্তুরূপনির্ভর? আবার এটিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে সৌন্দর্যের প্রয়োজনাত্মক এবং প্রয়োজন সম্পর্ক-শূন্য মূল্য নিয়ে দার্শনিকদের মতভেদটি। সৌন্দর্য নির্গুণ এবং সগুণ, সৌন্দর্য নির্বিশেষ ও বিশেষ— এই দুই মতবাদকে সমর্থন করে তাদেরকে আমরা পেলাম। বিশ শতকের প্রারম্ভে ক্রোচে আবার বিশুদ্ধ প্রকাশকে 'সুন্দর' এবং ত্রুটিপূর্ণ প্রকাশকে 'কুৎসিত' বলে সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে নতুন তত্ত্ব উচ্চারণ করলেন। শিল্পে 'ফর্ম'টাই বড়, 'ফর্ম' ছাড়া কিছুই নেই আর ক্রোচের এই ধারণাই তাঁকে এই জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্ররোচিত করেছিল। অথচ তাঁর প্রায় সমকালেই রুশদেশের মহান শিল্পী লিও তলস্তয় ভাবপ্রকাশে শিল্পীর নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার উপর জোর দিলেও 'সৌন্দর্য'কে শিল্পের অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য গুণ বলে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। শুধু তাই নয়, ধিক্কার দিলেন সৌন্দর্যরসিক বিলাসী-শিল্পীদের, যাঁদের রূপ-পিপাসা শিল্পকে ধনীর বিলাসের উপকরণে

পরিণত করে বৃহত্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

ভারতীয় আলংকারিকেরা 'সৌন্দর্য' বোঝাতে 'চারুত্ব', 'চমৎকার' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁদের কাছে সৌন্দর্য কোন বস্তুর গুণ নয়, সৌন্দর্য বোধের অধিষ্ঠান রসিকের হৃদয়ে। 'সৌন্দর্য'কে তাঁরা বলেছেন 'রস', 'চিত্ত বিস্তারক'। অগ্নিপুরাণে 'সৌন্দর্য'কে 'রস' ও 'আত্মচৈতন্য' বলে গণ্য করা হয়েছে। কুন্তকের 'বক্রোক্তি জীবিত' গ্রন্থে সৌন্দর্য হচ্ছে 'কবিকর্ম' আর পণ্ডিত জগন্নাথের মতে নিষ্কাম পরিতৃপ্তি ও অজাগতিক আনন্দই হল প্রকৃত 'সৌন্দর্য'। ভারতীয় আলংকারিকেরা 'রস' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আর 'রস'কেই সৌন্দর্যের সমার্থকরূপে বিবেচনা করায় সৌন্দর্য সম্পর্কে আর আলাদা আলোচনার প্রয়োজন হয় নি। একমাত্র চতুর্দশ শতকে আলংকারিক বিশ্বেশ্বর রচিত 'চমৎকার চন্দ্রিকা' ছাড়া সৌন্দর্য বিষয়ক আর কোনো গ্রন্থ চোখে পড়ে না।

'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র দার্শনিকপন্থায় না হলেও 'সৌন্দর্য' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যসৃষ্টির সামগ্রী হিসাবে যে কয়টি উপাদানের উল্লেখ করেছেন তা হল— বর্ণ, আকার, গতি, রব এবং অর্থযুক্ত বাক্য। ফুলের সৌন্দর্য বর্ণ ও আকারগত, গতির দ্বারা নৃত্যের সৌন্দর্য, রবের দ্বারা সংগীত এবং অর্থযুক্ত বাক্যের দ্বারা কাব্যের সৌন্দর্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মতই রবীন্দ্রনাথও এই 'সৌন্দর্য' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর জীবনের বিভিন্ন স্তরে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় পরিস্ফুটিত তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্ব।

সাধারণভাবে সৌন্দর্য বিষয়ে দুটি প্রধান ও স্থূল মতবাদের সঙ্গে আমরা পরিচিত— বস্তুগত সৌন্দর্যবাদ এবং ব্যক্তিগত সৌন্দর্যবাদ। প্রথম মতবাদের মতে সৌন্দর্য থাকে একটি বস্তুর মধ্যেই নিহিত, আমি যাকে সুন্দর দেখি সকলেই তাকে সুন্দর দেখে কারণ বস্তুতই তা সুন্দর। দ্বিতীয় মতবাদের মূল কথা, সৌন্দর্য বস্তুর মধ্যে নিহিত থাকে না, থাকে সৌন্দর্যভোক্তারই মনে, অর্থাৎ সৌন্দর্য নিতান্তই ব্যক্তিগত। রবীন্দ্রনাথের অভিমত এই যে কাউকে সুন্দর মনে করলে তবেই সে সুন্দর। এরই অভিব্যক্তি ঘটে—

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।

আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, 'সুন্দর'
সুন্দর হল সে।"[৫]

এর অর্থ সৌন্দর্য বস্তুতে নেই, তার অবস্থান মানুষের মনে। কান্ট তাই বলেছেন— 'Beauty is a state of mind, a satisfaction, which is purely subjective.'[৬] আবার হিউমও একই উক্তি করেছেন— 'Beauty is no quality in things temselves; but it exists merely in the mind which contemplates them'.[৭] রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে বলেছেন—

> "বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয় তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।"[৮]

যা আনন্দ দেয় মন তাকে সুন্দর বলে, একথা ঠিক, কিন্তু তা আনন্দ দেয় কেন? এ প্রশ্নটিও বিচার্য। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, যা কবির মনে তার সত্য স্বরূপে উপস্থিত তাই কবিকে আনন্দ দেয়, অর্থাৎ মন যাকে নিঃসন্ধিগ্ধভাবে সত্য বলে মনে করে তাকেই আমাদের সুন্দর মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য আমাদের কবি কীটসের একটি প্রবাদপ্রতিম উক্তিকে স্মরণ করায়— 'Truth is beauty, beauty is truth' অর্থাৎ সত্যই সৌন্দর্য, সৌন্দর্যই সত্য—সত্য এবং সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের মতেও অভিন্ন।

তবে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্বে সুন্দরকে সত্যের সঙ্গে অভিন্নতা প্রতিষ্ঠাতেই থেমে থাকেনি, তিনি সৌন্দর্যবোধের পূর্ণতা কোনদিকে অগ্রসর হয়েছে দেখতে চেয়েছেন এবং পূর্ণ সৌন্দর্যের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সৌন্দর্য উপভোগের জন্য সুন্দর বস্তু অপেক্ষা মনের গুরুত্ব যে অনেক বেশি সেকথা তিনি বলেছেন। কিন্তু সেই মনেরও যে আবার বিভিন্ন স্তর আছে এবং সেইস্তরগুলি সম্মিলিত অনুভবেই যে সৌন্দর্যের পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব সেকথা তিনি 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

> "কেবল বুদ্ধিবিচার দিয়া আমরা যতটুকু দেখিতে পাই তাহার

সঙ্গে হৃদয়ভাব যোগ দিলে ক্ষেত্র আরও বাড়িয়া যায়, ধর্মবুদ্ধি যোগ দিলে আরও অনেকদূর চোখে পড়ে, অধ্যাত্মদৃষ্টি খুলিয়া গেলে দৃষ্টিক্ষেত্রের আর সীমা পাওয়া যায় না।"[৯]

এখানে অবশ্য সৌন্দর্যতত্ত্ব নীতিশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র— এককথায় মঙ্গলবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল বলে কেউ কেউ অস্বস্তিবোধ করতে পারেন। কিন্তু এই অস্বস্তি থেকে উদ্ধারও করেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তিনি বলেন, মঙ্গলকাজে নিজেদের উপকার, সমাজের উপকার বলেই যে আমরা মঙ্গলকে চাই তা নয়, মঙ্গল আমাদের কাছে আকর্ষণীয়, তার মধ্যে একটা পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে বলে। মঙ্গলজনক ঘটনাগুলির মধ্যে এমন এক 'বিরোধহীন সুষমা' আছে যে তার প্রতি মন আকৃষ্ট না হয়ে পারেনা। মঙ্গলজনক কাজে মানুষের হিত হয়, এটা গৌণ ব্যাপার, মঙ্গল আমাদের মধ্যে সৌন্দর্য জাগিয়ে তোলে। আর এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমাদের পুরাণে লক্ষ্মী কেবল সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের দেবী নহেন, তিনি মঙ্গলের দেবী। সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণ স্বরূপ।"[১০]

'সৌন্দর্য' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধে ক্ষিতির মুখদিয়ে ও ব্যোমের উক্তি দিয়ে নিজ মনের অবস্থান বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে— 'সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু"।[১১] আবার,

" 'সৌন্দর্য' অনুভব করিবার জন্য সুন্দর জিনিসের আবশ্যকতা নাই, ভক্তি বিতরণ করিবার জন্য ভক্তি ভাজনের প্রয়োজন নাই—এরূপ পরম সন্তোষের অবস্থাকে আমি সুবিধা মনে করিনা।"[১২]

'সৌন্দর্য'কে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন অনেকটা নিও-প্লেটোনিকদের দৃষ্টি দিয়ে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে উপনিষদের ঋষিকবিদের এবং বৈষ্ণব দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য সন্ধানও ব্যর্থ হবে না আশা করি। কিন্তু ক্ষিতির মুখ দিয়ে সৌন্দর্যবিচারে সুন্দর বস্তুর Objective মূল্য রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সংকেতে ব্যক্ত করেছেন 'বঙ্গদর্শন'এ (২য় পর্যায়ে)

প্রকাশিত এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রদত্ত বক্তৃতামালায় সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সুন্দরের মধ্যে সামঞ্জস্য, মঙ্গল ও সত্য সন্ধান করেছেন। সুন্দর বস্তুর প্রতিটি অংশের সামঞ্জস্যই যে শুধু তাকে সুন্দর করে তা নয়, এই সামঞ্জস্য ক্রমশ বাহ্যরূপ অতিক্রম করে বৃহৎ জগতের বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে সুন্দরকে একসূত্রে আবদ্ধ করে, এটিই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অভিমত। এই জাতীয় সুন্দরকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মঙ্গলময় এবং যা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মঙ্গলময় তাকেই আবার গ্রহণ করেছেন সত্যরূপে। সত্যের সঙ্গে সুন্দরের সম্পর্ক আলোচনাতে তিনি স্মরণ করেছেন কীটসের সেই উক্তি সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর। তিনি ভারতীয় রসবাদীদের 'রসই কাব্যের আত্মা' এই সিদ্ধান্তকেও সমর্থন করেছেন। কিন্তু তিনি যখন বলেন— 'সৌন্দর্য প্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মূল লক্ষ্য নয়'[১৩] তখন এই ব্যাপারে ভারতীয় আংলকারিকেরা বলেন— 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'[১৪] তখন তিনি যে রস ও সৌন্দর্যকে সংস্কৃত আলংকারিকদের মতো সমার্থক মনেকরেননি সেটা বোঝা যায়। আর এর প্রমাণ মেলে রবীন্দ্রনাথের নিজের মন্তব্যেই— ''বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী''[১৫] অর্থাৎ 'আনন্দ' যাকে 'রস'ও বলা যায় ও 'সুন্দর' পৃথক দুটি গুণ তো বটেই, এমন কি সুন্দর স্বীকৃতি লাভ করে আনন্দদানের জন্যই। আবার প্রমথ চৌধুরী 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে সাহিত্যশিল্প যে বিশুদ্ধ আনন্দধর্মী এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন—

> ''সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়।.....কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি।''[১৬]

সাহিত্য শিল্পাদর্শের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী কলাকৈবল্যবাদের (Artfor Art's Sake) অর্থাৎ আনন্দবাদের শ্রেষ্ঠত্বকেই স্বীকার করেছেন। তিনি কয়েকটি প্রবন্ধে এই তত্ত্বকে আশ্রয় করে তাঁর সাহিত্যিক চিন্তাকে প্রকাশ করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর মতে, সাহিত্য বা শিল্প বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সাধনা এবং তা প্রধানতঃ শিল্পী বা সাহিত্যিকের গভীর কল্পনাপ্রসূত—

যথার্থ বাস্তবানুগ নয়। সাধারণত কাব্যে প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণনা পাওয়া যায়, বাস্তবজগতে তার যথার্থ পরিচয় লাভ করা যায় না। সুতরাং, কাব্যের প্রকৃতি মূলত মনঃকল্পিত এবং তার বর্ণনা বৈচিত্র্যের মধ্যেই কবির রসকল্পনা বা কবিত্ব নির্ভর। কবিত্ব বা শিল্পত্ব জাগতিক স্থূল প্রয়োজন বহির্ভূত অতিরিক্ত একটি আনন্দচেতনা মাত্র এবং বিশুদ্ধ আনন্দ সৃষ্টিই সাহিত্যের প্রকৃত আদর্শ। সাহিত্য বিচারে রবীন্দ্রনাথও কলাকৈবল্যবাদ অর্থাৎ রসসর্বস্বতা নীতিরই সমর্থক ও পরিপোষক ছিলেন এবং প্রমথ চৌধুরী এই বিশিষ্ট সাহিত্য মতবাদের অনুকূলেই তাঁর সর্ববিধ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধে টম্‌সন সাহেব রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নিয়ে যে অভিযোগ করেছিলেন তা অস্বীকার করে 'চিত্রাঙ্গদা'কাব্যের সৌন্দর্য ও ভাবৈশ্বর্যের বিস্তৃত আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। তাই তিনি প্রবন্ধে বলেছেন—

> ''রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্য মানুষের যৌবনস্বপ্নের একটি অপূর্ব এবং সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র।.....তাই আমরা 'সৌন্দর্য' শব্দের বদলে সৌন্দর্যের নানারকম উপকরণের উল্লেখ করি, যথা মাধুর্য ঔদার্য কান্তি দীপ্তি সুষমা সৌকুমার্য লালিত্য লাবণ্য চমৎকারিত্ব মনোহারিত্ব ইত্যাদি। এ-সব নামই সৌন্দর্যের বেনামি হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। ফলে এ-সবের প্রসাদে সৌন্দর্যের অর্থ স্পষ্টতর হয় না, কিন্তু সৌন্দর্য নামক গুণটির অনুভূতি লোকসামান্য।''[১৭]

আবার এই প্রবন্ধেই বলেছেন—

> ''যদি কোনো কবির কল্পনায় দেহ-দেহীর ভেদাভেদ জ্ঞান মূর্ত হয়ে ওঠে তা হলে সে কবির কল্পনাকে কি শুধু দৈহিক বলা চলে? যা কেবলমাত্র দৈহিক তার অন্তরে সত্য আছে কিন্তু সৌন্দর্য নেই। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন যে, কামলোকের উপরে রূপলোক বলে আর একটি লোক আছে। যে ব্যক্তি তাঁর বর্ণিত বিষয়ক কামলোক থেকে রূপলোকে তুলতে পারেন তিনি যথার্থই কবি। চিত্রাঙ্গদা যে রূপলোকের বস্তু, কামলোকের নয়, তা যাঁর অন্তরে চোখ আছে তিনিই প্রত্যক্ষ করতে পারেন।..... চিত্রাঙ্গদা একাধারে কাব্য চিত্র ও সংগীত, অতএব তা চরমকাব্য।''[১৮]

পরবর্তীতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। অসাধারণ শব্দকুশলী শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ নানান উদাহরণ নিয়ে সুন্দর সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন অনবদ্য ভঙ্গিতে—

> ''সুন্দর জিনিষের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা— যেমন রূপ তেমনি ভাব। বহিরঙ্গ যা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়ে সুন্দর বর্তমান হল।''[১৯]

এবং পরক্ষণেই বলেছেন—

> ''আকাশের রামধনুতে যিনি সুন্দর, তিনি রয়েছেন পৃথিবীর ধূলিকণায়, তিনিই রয়েছেন অতলের তলাকার একটুকরো ঝিনুকের ভিতরে বাইরে সমান সৌন্দর্য ও শোভা বিকীর্ণ করে।''[২০]

সুন্দরকে অবনীন্দ্রনাথ সীমার ধ্যান থেকে মুক্তি দিয়েছেন অথচ অসীমই যে সীমার মধ্যে শোভা পাচ্ছে চিরপরিচয়ের মধ্যে নবপরিচয়ের ঔজ্জ্বল্যে। এ যেন অনেকটা হেগেলের absoluteএর মতো। এই সত্য অবনীন্দ্রনাথের চোখ এড়িয়ে যায়নি। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুজনেই ছিলেন শিল্পী তাই তাঁদেরকে Subjectivist বা Objectivist কোন শ্রেণীতেই বিভক্ত করা যায়না। তাঁরা উভয়েই ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন আবার পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শনের সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ ছিল সর্বদা। তাই এইজন্যই বোধহয় সৌন্দর্য নিয়ে দার্শনিকদের তর্ক আলোচনায় তাঁরা কোনোদিনই অংশ নেননি।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন আজন্ম সৌন্দর্য সাধক। ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ ও রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে বলেন্দ্রনাথের বেড়ে ওঠার জন্যই তিনিও ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। আত্মগত ভাবনা কামনার পক্ষ নির্ভর করে তিনি রোমান্টিকতার আকাশে ডানা মেলে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য—

> ''তিনি সৌন্দর্য ভোগ করিয়াছেন এবং অপরের চোখে আঙুল দিয়ে কখনো বা তাহার উত্তরীয় প্রান্ত টানিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে সেই সৌন্দর্য দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার কবিমন অখণ্ডকে খন্ডিত করিতে, সৌন্দর্য নিঙড়াইয়া তত্ত্ব বাহির

করিতে, অত্যন্ত পীড়াবোধ করে।..... সৌন্দর্যে বিশ্বরূপ দর্শনই মানবজীবনের মহৎ কর্তব্য, ইহাই যেন তিনি বলিতে চাহেন। সৌন্দর্যদর্শনের ও সৌন্দর্যভোগের এমন কীট্‌সীয় দৃষ্টি ও মন লইয়া আর কোন বাঙালি লেখক জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহাই বলেন্দ্রনাথের প্রতিভার একাধারে বৈশিষ্ট্য এবং সীমা।"[২১]

তাই বলেন্দ্রনাথের দুটি বিশিষ্ট গুণ হল সৌন্দর্য দর্শন ও সমালোচনার সৃষ্টিকার্য। মানুষের সৃষ্টি ও প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে অখণ্ডরূপের সন্ধানই হল সৌন্দর্য সন্ধান। এটি বলেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা। আর এটি তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই। তাঁর সৌন্দর্য দর্শনরূপ মূলশক্তি সংস্কৃত কাব্যের ও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ সৌন্দর্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হবার ফলে অল্পবয়সে তাঁর শক্তি অনেক পরিমাণে পরিণতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। আর তাই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মন্তব্যটি এখানে মনে পড়ে—

"সৌন্দর্যের আবিষ্কারই তাঁহার প্রধান কার্য ছিল, যে সৌন্দর্য অন্যের চোখে প্রকাশ পাইত না। তিনি তাহা বাহির করিয়া আনিয়া দেখাইয়া দিতেন।"[২২]

বলেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের মতোই সাহিত্যের উভচর— একাধারে কবি ও সমালোচক। কবি হিসাবে তিনি সৌন্দর্য বিমুগ্ধ রোমান্টিক গোষ্ঠীর নিকট জ্ঞাতি হলেও, সমালোচকরূপে তাঁর প্রতিভার বিচিত্র অভিব্যক্তি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তবে রবীন্দ্রনাথের মতই গদ্যশিল্পী বলেন্দ্রনাথও কাব্যধর্ম পিপাসু। রোমান্টিক সৌন্দর্য তৃষ্ণা ও রূপকল্প রচনার আগ্রহ এবং প্রবণতায় উভয়ের মনঃ প্রকৃতির সাদৃশ্যও বিস্ময়কর। আবার, জলের সঙ্গে নারীর স্বাভাবিক সখিত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ছিন্নপত্রে আবার জলের পটভূমিতে নারীরূপের সৌন্দর্য বর্ণনাও রবীন্দ্রনাথের। যমুনার উল্লেখ বলেন্দ্রনাথ বারবার করলেও রবীন্দ্রনাথের মতো তাকে প্রতীকে পরিণত করতে পারেননি। তিনি স্নানসিক্ত নারীদেহের বর্ণনাতেই আনন্দ পেয়েছেন, সে বর্ণনায় উপমা অলংকার এবং ভাষার কারুকার্যে অর্ধস্ফুট লাবণ্য, বিলাসের লাল-নীল আলো জ্বালিয়েছেন যেন।

বলেন্দ্রনাথ সহজ সৌন্দর্যের নিষ্ঠাবান সাধক ছিলেন এবং এই প্রাণময় কমনীয় সৌন্দর্যের সুগভীর প্রেরণাই তাঁর সকল সাহিত্য কর্ম সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত করেছে। তিনি যথার্থ আবেগ চঞ্চল কবি— তত্ত্ব বা তথ্য বিচার নির্দেশক কলাকুশলী সমালোচক নন। ভারতীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য সন্ধানে বলেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী। ভারতবর্ষীয় সৌন্দর্য বিচারের প্রতিই তিনি মুগ্ধ ছিলেন। 'হিন্দু দেবদেবীর চিত্র' প্রবন্ধে তাই তিনি বলেন—

> ''দেবতাপ্রিয় ভারতবর্ষীয় কল্পনা বহিঃপ্রকৃতি ও মানবচরিত্রে যেখানে যে সৌন্দর্য্যটুকু অনুভব করিয়াছে, তাহাতে একটি নির্দিষ্ট গঠন দিয়া নিঃশব্দে আপন দেবতা গড়িয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য ভারতবর্ষের পৌরাণিক দেবভূমিতে আসিয়া হৃদয় যেমন পরিতৃপ্ত হয়, এমন ত আর কিছুতে নহে। গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্তির অতুলনীয় দেহসৌন্দর্য্য হয় ত আমাদের দেবলোক সর্ব্বত্র তেমন সুলভ নহে, কিন্তু এই সকল দেবমূর্তিতে আমাদের অন্তরের বহু গভীর আকাঙ্ক্ষা মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষের অনাবিল অন্তরতম অন্তর সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে।''[২৩]

এই 'অন্তরতম অন্তরসুন্দর' এর অভিব্যক্তিই বলেন্দ্র প্রবন্ধের আন্তরিক উৎস। কখনও বা দেবদেবীর চিত্রাঙ্কণে মানবীয় জীবনব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সৌন্দর্য সাধক বলেন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

> ''.....এই মৃত্যুই মর্ত্ত্যের প্রধান সৌন্দর্য্য-পৃথিবীর সকল সুখ-দুঃখ বেদনা আনন্দের চরম পরিণাম। এই যে সকলই আছে, অথচ সর্ব্বদাই হারাইবার ভয়, এই যে নশ্বরতা ইহাতেই ইহলোকের সকল সুখ-দুঃখ নিহিত। দেবলোকে যদি এই মৃত্যুই না রহিল, তবে দেবতাদের সুখ-দুঃখের সহিত আমাদের সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ কিসের? ভারতবর্ষীয় হৃদয়, সুতরাং অমরধামেও মৃত্যুর ছায়া রচনা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সতীর দেহত্যাগে ও রতিপতির অনঙ্গীকরণে এই মৃত্যুরই অনুরূপ চিত্র সূচিত হইয়াছে।''[২৪]

সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় বলেন্দ্রনাথের সবচেয়ে আকর্ষণ ছিল কালিদাসের

প্রতি। কালিদাসের প্রতি তিনি কতখানি অনুরক্ত ছিলেন তা বোঝা যায় কালিদাসের প্রতিভা সম্পর্কিত কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের আগে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় নেমেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও কালিদাসকে নিয়ে সাহিত্য চর্চায় মেতেছিলেন তবে সেটা বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের একবছর পরে। কালিদাস নারী ও প্রকৃতি সৌন্দর্যের কবি। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

> ''নারী ও প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের প্রতি এমন নিবিড় প্রেম অন্য কোন কবিতে দেখা যায় না। যেখানে তপোবনের মধ্যে ঋষিবালিকার সমাবেশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার সেই দুই অনুরাগের একত্র মিলন হইয়াছে।''[২৫]

আবার 'মেঘদূত' নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ উভয় প্রাবন্ধিকই রচনা সৃষ্টি করেছেন। 'মেঘদূত' প্রবন্ধের শেষে বলেন্দ্রনাথ কালিদাসের সৌন্দর্য ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মেঘের চিত্র এঁকে মিলনসুখ অনুভব করার প্রয়াসকে প্রাচীন কবির মতো তিনিও গ্রহণ করেছেন। তাই 'মেঘদূত' প্রবন্ধে বারেবারে নতুন রাগিনী ঝংকৃত হয়েছে। তাই তিনি বলেছেন—

> ''কালিদাসের সৌন্দর্য্যে আমাদের হৃদয় যেন প্রতিদিন নূতন নূতন আনন্দ লাভ করিয়া তৃপ্ত হয়— তাঁহার সৌন্দর্য আমরা যেন দিনেদিনে উত্তম রূপে উপলব্ধি করিতে পারি।''[২৬]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে মানবাত্মার এই রহস্যময় চিরবিরহের বিষয়টির একটি পূর্ণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

> ''আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানসসরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়। সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই।''[২৭]

যদিও সৌন্দর্য ধারণা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'আলোচনা' এই দুটি বইয়ের মধ্যে সৌন্দর্য সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত হয়েছে তা যেন বলেন্দ্রনাথের 'নগ্নতার সৌন্দর্য' প্রবন্ধকেই স্মরণ করায়। সৌন্দর্য ধারণার সঙ্গে উভয়েই সৌষম্য, সামঞ্জস্য, পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি বাইরের জগতের সঙ্গে তার আত্মিক অভিন্নতা ইত্যাদি ধারণাগুলিকে যোগ

করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'সৌন্দর্য' সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—

> ''সৌন্দর্য উদ্রেক করার অর্থ আর কিছু নয়— হৃদয়ের অসাড়তা অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া।''[২৮]

আর এই উপলব্ধি ছিল বলেই তাঁর 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা', 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র সমালোচনা বস্তু নিরপেক্ষ না করে নিজের হৃদয়ের জিনিস করে তুলেছেন। অনুরূপভাবে বলেন্দ্রনাথও তাঁর প্রবন্ধে উক্ত মতই ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন—

> ''নগ্নতার মধ্যে স্বভাবের স্ফূর্ত্তি হয়, এই জন্যই তাহার সৌন্দর্য্য কূলে কূলে। তাহার মধ্য হইতে নিংড়াইয়া রস বাহির করিবার চেষ্টা বিফল। নগ্ন জ্যোৎস্নাকে ছাঁকিয়া পরদার আড়ালে উপভোগ করা যায় না, পূর্ণ জ্যোৎস্নায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে।''[২৯]

আর এই উপভোগের রসেই বলেন্দ্রনাথের আলোচনা সমৃদ্ধ। তাই তিনি বলেন—

> ''সৌন্দর্য্য সহজভাবেই সুব্যক্ত, তাহার উপর রঙ ফলাইয়া উজ্জ্বল করা যায় না। নগ্ন সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে তাহাতে ডুবিতে হইবে। কবিরা সৌন্দর্য্যের হৃদয়ে প্রবেশ করেন বলিয়াই আনন্দ পাইয়া থাকেন।''[৩০]

আবার কখনো তিনি প্রেমের মূলে যে সৌন্দর্য আছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

> ''প্রেমের মূলে সৌন্দর্য্য উভয় সাহিত্যেই। আমাদের বৈষ্ণব কবিরা এই সৌন্দর্য্যে তন্ময়। সেই জন্যই ত তাঁহাদের প্রেমসঙ্গীতে তরঙ্গে তরঙ্গে সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যের হৃদয়ে ডুবিতে ডুবিতে তাঁহাদের আর আশ মিটে নাই— যত ডুবিয়াছেন, ততই আরও আরও। তাঁহারা কিছুতেই জুড়াইতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য কাব্যে সৌন্দর্য্যের গভীর অগাধে এরূপ নিমজ্জন দেখা যায় কি না সন্দেহ। বৈষ্ণব কবির ভাষা কেবলই সৌন্দর্য্যময়ী, আকুলতাময়ী। পাশ্চাত্য কবি সৌন্দর্য্যে আকুল হইয়া গাহিয়াছেন বটে, কিন্তু সে আকুলতা আর এ আকুলতা বিস্তর তফাৎ। সৌন্দর্য্য প্রেমে বৈষ্ণব কবি তুলনারহিত। সে গভীরতা এবং বিস্তৃতি অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য।''[৩১]

তাই বলেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল পারিপাট্যর প্রতি আগ্রহই সংস্কৃত সাহিত্যানুকূল্যের অভিনব রূপে অভিব্যক্ত।

বলেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের মতোই সাহিত্যের উভচর— একাধারে সমালোচক ও কবি। কবি হিসাবে তিনি সৌন্দর্য বিমুগ্ধ রোমান্টিক গোষ্ঠীর কাছে কাছের লোক হলেও, সমালোচকরূপে তাঁর প্রতিভার বিচিত্র অভিব্যক্তি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্র প্রভাবিত হয়েও রবীন্দ্রনাথের মতো সমালোচনা উপলক্ষ্যে তত্ত্ব উপস্থিত করেন নি, নিরপেক্ষ বিচারে কাব্যসৌন্দর্য প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছেন। বলেন্দ্রনাথের কবিতাগুলি অসাধারণ সৌন্দর্যবোধে ভরপুর। তাঁর কবিমন পৃথিবী ও প্রকৃতিকে, মানব মনকে ও মানব আদর্শকে যেভাবে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন, উপভোগ করেছেন তার প্রমাণ মেলে 'আষাঢ় ও শ্রাবণ', 'সখ্য', 'শিব', 'জানালার ধারে' প্রবন্ধে। বলেন্দ্রনাথ স্বয়ং একজন গীতিকবিও ছিলেন। 'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী' এই দুটি কাব্যগ্রন্থ তাঁর কবি প্রতিভার সার্থক নিদর্শন। 'মাধবিকা' বসন্তের কবিতা, 'শ্রাবণী' বর্ষার। আর এই বর্ষা ও বসন্ত ঋতু উভয়ই যথাক্রমে নারী সৌন্দর্য ও নারী প্রেমের প্রধান প্রতীক। এই দুই ঋতু এক্ষেত্রে কবি প্রেয়সীর সৌন্দর্যগানে 'রসঘন' পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই নারী সৌন্দর্যের জয়গান। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্য ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় নি বলেন্দ্রনাথের রচনার পূর্বে। বলেন্দ্রনাথ এখানে অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী। রবীন্দ্রনাথ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বন্দনাগানগুলি সনেটের আকারে লিখেছেন, বলেন্দ্রনাথও অনুরূপভাবে তা করেছেন। তিনি 'কড়ি ও কোমল' ভালো করে পড়ে সংস্কৃত সাহিত্যে স্নাত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন কাব্যে—

''দেবতার মতিগতি তা'ও বুঝা যায়,
তোমারে বুঝিয়া ওঠা সেই মহা দায়,
হে ভামিনি! কিসে যে প্রসন্ন হও কবে,
কিসে বা বিমুখ, কোন শাস্ত্র নাহি ভবে—''[৩২]

অথবা,

''সর্ব্ব অঙ্গে ধ্বনি তব বাজিছে সুন্দরী
কঙ্কন মেঘলা হার নূপুর গুর্জ্জরী
নানা সুরে নিশিদিন, রতিপতি বুঝি
কায়া ত্যজি' তব অঙ্গে ফিরে কায়া খুঁজি'—''[৩৩]

বলেন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'শ্রাবণী' যখন প্রকাশিত হয়েছে তখন রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি' শেষ হয়েছে। 'চৈতালি'র প্রভাব 'শ্রাবণী'তেও পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতোই বলেন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যলোকের স্তবগানে মুখর। তার প্রমাণ মেলে 'মেঘদূত' কবিতার মধ্যে—

"বর্ষা নামিয়াছে আজি দুই তীরপরে,
নদী কাঁপে থর থর নীল নীরভরে।
তরীমাঝে বসি বসি পড়ি মেঘদূত
মনোমাঝে জেগে ওঠে সে কাল নিখুঁত।"[৩৪]

আবার,

"ঋতু পরে ঋতু আসি পিয়াইত মধু,
সসাগরা বসুন্ধরা হত মোর বধূ;
কালস্রোত বহে যেত পথপার্শ্ব দিয়া—
তব সঙ্গরসে ভোর মুগ্ধ মোর হিয়া।"[৩৫]

বলেন্দ্রনাথের রচনাগুলি নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যভোগস্পৃহা হতে উদ্ভূত, তাঁর কাব্যবিচারও সমালোচনা বেনামিতে সৌন্দর্য সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। বলেন্দ্রনাথের কবিমন কেবল লিপির ভাষাতে নয়, রেখার মানচিত্রেও রূপসৌন্দর্যের সন্ধান করে ফিরেছে; ইতিহাসের মৃত তথ্য ভাণ্ডারে চিত্রের প্রামাণ্য মাধ্যমে উড়িষ্যার প্রেম সৌন্দর্যাতুর প্রাচীন আত্মাটিকে আবিষ্কার করেছেন তিনি—

"শুধু ধর্ম নহে, শুধু ব্রাহ্মণের গর্ব্ব অথবা বৌদ্ধ সন্ন্যাসমাহাত্ম্য নহে, শুধু একটা বিপ্লবের ইতিহাস নহে; কিন্তু এই দেবমন্দিরের ভাস্কর্য্যে এ দেশের প্রশান্ত প্রাচীন সভ্যতার একটি অখণ্ড চিত্র, একটি সম্পূর্ণ মহিমা চিরদিনের মত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। পাষাণে খোদিত শত নারীমূর্তির কত বিভিন্ন প্রকারের কেশ-বিন্যাস, কত বিচিত্র বেশভূষা, হস্তে কত বিস্মৃত প্রাচীন যন্ত্র, গঠনে কি মায়ামন্ত্র, ভঙ্গীতে কি অবলীলা মাধুরী।"[৩৬]

আর এই উড়িষ্যার দেবতা-দেউলের আলোচনা পাথরের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা ছাড়া কি বলা যায়? তাই বলেন্দ্রনাথের আত্মভাবমুগ্ধ নম্র-নিবিড় উষ্ণ স্পর্শোজ্জ্বল

কবি-হৃদয়ের ব্যক্তিগত সুর প্রতিটি প্রবন্ধেই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। তাঁর স্মৃতি বিলাসী রূপ রসিক মন প্রতিটি বিষয় বা ভাবের উপর এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের রেখাচিত্র অঙ্কন করেছে। জীবন ও জগতে সকল ক্ষেত্র থেকেই সৌন্দর্য আবিষ্কারের এক গভীর প্রবণতা বলেন্দ্রনাথের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বলেন্দ্রনাথের ভাবচিন্তা কল্পনামূলক অধিকাংশ প্রবন্ধেই কল্পনার বা ভাবাবেগের প্রবলতা ও উদ্দামতার সঙ্গে তাঁর অনন্ত সৌন্দর্য প্রবণতারও সমন্বয় রচিত হয়েছে এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের সহায়তায় বলেন্দ্রনাথ সকল বিষয় বা ভাবের মূলগত সত্যের স্বরূপ সহজেই উদ্ঘাটন করেছেন। কল্পনা বিলাসী হলেও তাঁর কল্পচিত্তের মধ্য দিয়ে অন্তঃসলিলা বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তাধারা সততই প্রবহমান এবং সেইজন্য কল্পনাবিলাসের সাথে তাঁর ভাব বা চিন্তার অর্থগত সুস্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ নিছক গদ্যে, গীতিকবিতা নয়। মনুষ্য সমাজ জীবনে সাধারণত নগ্নতার কোন স্থান নেই; তা সর্বদাই কুৎসিত বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু সৌন্দর্য প্রিয় বলেন্দ্রনাথ নগ্নতার মধ্যেও সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন এবং তাঁর প্রখর সৌন্দর্যবোধের সহায়তার এক গভীর অর্থবহ জীবন সত্য প্রকাশিত হয়েছে—

> ‘‘নগ্নতার চতুর্দ্দিকে একটা দীপ্ত লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, সেই সেই লাবণ্য-দীপ্তির মধ্যে সৌন্দর্য্যের আত্মা সন্নিবিষ্ট। নগ্ন প্রকৃতির হৃদয়ে ডুবিয়া দীর্ঘ জীবন-পথের কাতর কোলাহলে আমরা যে বিস্মৃত হই, সে কেবলই এই দীপ্ত আত্মার সৌন্দর্য্যে। দূরদেশ হইতে নগ্নতার মধ্যে বিচরণ করিবার ক্ষেত্র আছে বলিয়া মনে হয় না, নয়নাতীত অতীন্দ্রিয় কিছু ঠাহরাইয়া উঠা যায় না। তাহার সৌন্দর্য্যে বিচরণ করিবার যত অবসর পাইতে থাকি, সে অনির্ব্বচনীয় রহস্য-মাধুরী মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়, অনন্তের মুক্ত সৌন্দর্য্য সেবনে আকুল হইয়া উঠি। জীবনের মর্ম্মে মর্ম্মে সেই শুভ্র বিমল জ্যোৎস্না— নগ্নতা তড়িৎকম্পনের মত স্পর্শ করিয়া যায়, চিরনবীন সৌন্দর্য— প্রবাহে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্তি লক্ষিত হয়। নগ্নতার সৌন্দর্য্যে প্রাণ সম্যক প্রস্ফুটিত।’’[৩৭]

তথ্যসূত্র

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'ছিন্নপত্রাবলী', ৫৫ সংখ্যক চিঠি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৯২

২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য', সৌন্দর্যবোধ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৩৫

৩। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, 'শিল্পায়ন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০০,পৃ. ৩১

৪। মুখোপাধ্যায় বিমলকুমার, 'সাহিত্য বিবেক', দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৮

৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, শ্যামলী, 'আমি', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৮৯৪, পৃ. ৭১২

৬। লাহা জগত, 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য', উষা পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৪০৬, পৃ. ৪৮

৭। তদেব, পৃ. ৪৮

৮। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের পথে', ভূমিকাংশ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৪০৯, পৃ. ৮

৯। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, 'সৌন্দর্যবোধ', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৪১

১০। তদেব, পৃ. ৪৩

১১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী (প্রথম খণ্ড), 'পঞ্চভূত', বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৪০৯, পৃ. ৮৯৩

১২। তদেব, পৃ. ৯৪১

১৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের পথে', ভূমিকাংশ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৪০৯, পৃ. ১০

১৪। গুপ্ত অতুলচন্দ্র, 'কাব্য জিজ্ঞাসা', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৪০৩, পৃ. ২৩

১৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, 'সৌন্দর্যবোধ', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৩৭

১৬। চৌধুরী প্রমথ, প্রবন্ধসংগ্রহ, 'সাহিত্যে খেলা', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ২০০০; পৃ. ৯৭

১৭। চৌধুরী প্রমথ, প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'চিত্রাঙ্গদা', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৯৭

১৮। তদেব, পৃ. ২০৭

১৯। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, 'শিল্পায়ন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০০,পৃ. ৩৭

২০। তদেব, পৃ. ৩৮

২১। জোয়ারদার দেবদাস (সম্পা.), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৫২

২২। তদেব, পৃ. ৩

২৩। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'হিন্দু দেবদেবীর চিত্র', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-১৩৭২, পৃ. ৬০

২৪। তদেব, পৃ. ৬০

২৫। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কন প্রতিভা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলাকাতা, ১৩৭১, পৃ. ১৪

২৬। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'মেঘদূত', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ. ১৬৯

২৭। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য, 'মেঘদূত', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩১৪, পৃ. ১৬

২৮। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, আলোচনা, 'কবিরকাজ', বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯১৩, পৃ. ৩৭

২৯। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'নগ্নতার সৌন্দর্য্য', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলাকাতা, ১৩৭২, পৃ. ২৫৯

৩০। তদেব, পৃ. ২৬১

৩১। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'প্রেম: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ. ২৬১

৩২। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, মাধবিকা, 'সমস্যা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৭২; পৃ. ৬৮

৩৩। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, মাধবিকা, 'শিঞ্জন', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৭২; পৃ. ৬৮

৩৪। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, শ্রাবণী, 'মেঘদূত', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৭৫-৭৬

৩৫। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, শ্রাবণী, 'পথেপথে', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৭৫-৭৬

৩৬। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'প্রাচীন উড়িষ্যা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৫২০

৩৭। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'নগ্নতার সৌন্দর্য্য', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ. ২৫৮

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য : বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের নিজস্বতা

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য: বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের নিজস্বতা

বলেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনায় বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় দান করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল অর্থাৎ তিনি যে আবাল্য সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করেছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের বিচিত্র ভাবসম্পদ ও রূপ-রস দ্বারা বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য সন্ধানী প্রতিভা যে পরিপুষ্ট হয়েছিল, তা তাঁর বিশিষ্ট সংস্কৃত কবি ও নাট্যকারগণের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের সরস আলোচনা হতেই প্রমাণিত হয়।

বাল্যকালে বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজে ভরতি হন। সেখানে কয়েকবছর পড়াশুনা করার পর হেয়ার স্কুলে চলে যান এবং সেখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বলেন্দ্রনাথের স্কুলের শিক্ষার অনেকটাই সংস্কৃত কলেজে। তাই সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনায় তাঁর টান বোধহয় একটু বেশি। কিন্তু তাই বলে তাঁর বিশ্লেষণ ভঙ্গি ও রসজ্ঞতা সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের নির্দেশ মানে না। সেক্ষেত্রে ঠাকুরবাড়ির পরিবেশই বলেন্দ্রনাথকে দেশি-বিদেশী সাহিত্যচর্চার শিক্ষা দিয়েছে এবং অনেকসময়েই পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনাও তিনি করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি পথিকৃৎ নন। কারণ বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখ সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় বলেন্দ্রনাথের পূর্বসূরী। তুলনামূলক আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম আরম্ভ করলেও বলেন্দ্রনাথ দৃষ্টিভঙ্গিতে ও স্বাধীন চিন্তায় যে বিশিষ্ট তা বলাইবাহুল্য।

সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বন করে বলেন্দ্রনাথের আলোচনা শুরু হয় ১২৯৬ সালে, 'ভারতী'ও 'বালক' পত্রিকায়। তখনও রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় প্রবেশ করেননি। বলাবাহুল্য, কালিদাসের 'মেঘদূত'কে উপলক্ষ করেই সংস্কৃত সাহিত্য জগতে তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় বলেন্দ্রনাথের সবচেয়ে আকর্ষণ ছিল কালিদাসের প্রতি। কালিদাসকে এর আগে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ সকলেই বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আর বলেন্দ্রনাথ যে কালিদাসের প্রতি কতখানি অনুরক্ত ছিলেন

তা স্পষ্টতা পায় কালিদাসের প্রতিভা সম্পর্কিত কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে। এখানে তাঁর গরিমাদীপ্ত আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

'উত্তরচরিত', 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা', 'কাব্যে প্রকৃতি', 'মৃচ্ছকটিক', 'পশুপ্রীতি', 'ঋতুসংহার', 'রত্নাবলী', 'মেঘদূত', 'জয়দেব', প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি ও কাব্যের আলোচনায় বলেন্দ্রনাথের উদার রসবোধ ও বিচার নৈপুণ্যের সম্যক পরিচয় মেলে। এরকারণ আগেই উল্লেখ করেছি শৈশবের শিক্ষার ফল। এখন উপরোক্ত প্রবন্ধগুলিতে বলেন্দ্রনাথ কতটা স্বাধীন চিন্তার পরিচয় রেখেছেন তার পর্যালোচনা করব।

'কাব্যে প্রকৃতি' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রকৃতির সাথে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকৃতির একটি সূক্ষ্ম তফাৎ যেন এ প্রবন্ধের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি শেক্সপীয়রের নাটকের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন—

> ''শেক্ষপীয়রের নাটক পড়িতে পড়িতে একটা কথা মনে হয় যে
> শেক্ষপীয়র সমস্ত হৃদয়ে প্রকৃতিকে ভালবাসিলেও প্রকৃতির সহিত
> তাঁহার সামাজিকতা বড়ো নাই।''[১]

সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা বলেন্দ্রনাথ বিশেষ না করলেও কেবল একটি মাত্র প্রবন্ধে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় সাধারণভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশেষদিক আলোচনা করেছেন। সেই প্রবন্ধটিই হল আমাদের আলোচ্য 'কাব্যে প্রকৃতি'। পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রকৃতি বাইরের শক্তি, সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতি মানুষের সহমর্মীসঙ্গী। তাই বলেন্দ্রনাথ বলেন এই প্রবন্ধে

> ''শেক্ষপীয়রে প্রকৃতির উপর মানব জয়ী হইয়াছে—প্রকৃতির উপর
> সে কর্ত্তৃত্ব করে, প্রকৃতির সহিত ঘর করে না।''[২]

যদিও রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্তর্গত 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে মিরান্দা ও শকুন্তলার প্রাকৃতিক পরিবেশের তুলনা করে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। তিনি বলেছেন—

> ''টেম্পেস্টে বহিঃ প্রকৃতি এরিয়েলের মধ্যে মানুষ আকার ধারণ

করিয়াছে, কিন্তু তবু সে মানুষের আত্মীয়তা হইতে দূরে রহিয়াছে। মানুষের সঙ্গে তাঁহার অনিচ্ছুক ভৃত্যের সম্বন্ধ। সে স্বাধীন হইতে চায় কিন্তু মানবশক্তির দ্বারা পীড়িত আবদ্ধ হইয়া দাসের মতো কাজ করিতেছে। তাহার হৃদয়ে স্নেহ নাই, চক্ষে জল নাই। মিরান্দার নারীহৃদয়ও তাহার প্রতি স্নেহ বিস্তার করে নাই। দ্বীপ হইতে যাত্রাকালে প্রস্পেরো ও মিরান্দার সহিত এরিয়েলের স্নিগ্ধ বিদায় সম্ভাষণ হইল না। টেম্পেস্টে পীড়ন, শাসন, দমন, শকুন্তলার প্রীতি, শান্তি, সদ্ভাব। টেম্পেস্টে প্রকৃতি মানুষের আচার ধারণ করিয়াও তাহার সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধে বদ্ধ হয় নাই; শকুন্তলায় গাছপালা পশুপক্ষী আত্মভাব রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়া গেছে।”[৩]

আমরা জানি, বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ দিয়ে যাত্রা ১২৯৬ সালে শুরু করলেও রবীন্দ্রনাথ তখনও সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় প্রবেশ করেননি। বলেন্দ্রনাথের ঠিক একবছর পর অর্থাৎ ১২৯৭ সালের ৮ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ‘মেঘদূত’ কবিতা রচিত হয় আরও এক বছর পর তাঁর ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধ ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় (১২৯৮) প্রকাশিত হয়। আর ‘কাব্যে প্রকৃতি’ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের ‘শকুন্তলা’ (আশ্বিন, ১৩০৯)-র ঠিক আট বছর আগের লেখা। স্বীকার করতে দ্বিধানেই বলেন্দ্রনাথের এরূপ রচনা রবীন্দ্রনাথের পরামর্শেরই ফল। কারণ সাহিত্যরসিক বলেন্দ্রনাথ প্রকৃতির পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে বলেছেন—

‘‘প্রকৃতি সেখানে মানবের সখীরূপে ফুটে না, হয় ছায়ার মত, নয় মানবের আজ্ঞাধীন সেবকরূপে অবস্থিতি করে। যেমন, মার্চ্যান্ট অফ্ ভেনিসে লোরেঞ্জো ও জেসিকার প্রণয়দৃশ্যে, অথবা টেম্পেষ্টে ফার্দিনান্দ ও মিরান্দার প্রণয় ঘটনায়”।[৪]

রবীন্দ্রনাথও ঠিক একই মন্তব্য করেছেন ফার্দিনান্দ ও মিরান্দার প্রণয় ব্যাপারে প্রকৃতির ভূমিকা প্রসঙ্গে। এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রকৃতি সম্পর্কিত এই চিন্তা লিখিতভাবে বলেন্দ্রনাথের রচনাতেই প্রথম পাওয়া গেছে।

কালিদাসের প্রতিভা ও কবিত্ব সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথের পাঁচটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আছে। 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা' প্রবন্ধে কালিদাসের মহাকাব্যগুলির একটি মূল বৈশিষ্ট্যকে চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গক্রমে তিনি দেখিয়েছেন বাল্মীকির কাব্যে গম্ভীর ভীষণভাব যেরকম ব্যক্ত হয় কালিদাসে তা নেই বরং কালিদাস উজ্জ্বল ও মধুর রসেরই কবি। করুণরসও কালিদাসে নেই। কালিদাস নারী ও প্রকৃতি সৌন্দর্যের কবি। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

> ''নারী ও প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের প্রতি এমন নিবিড় প্রেম অন্য কোন কবিতে দেখা যায় না। যেখানে তপোবনের মধ্যে ঋষিবালিকার সমাবেশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার সেই দুই অনুরাগে একত্র মিলন হইয়াছে।''[৫]

এরই পাশাপাশি তিনি কালিদাসের খণ্ডচিত্র ও তার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে মননশীল আলোচনা করেছেন—

> ''এইরূপ খণ্ড খণ্ড চিত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারুকৌশলের প্রতি কবির বিশেষদৃষ্টি থাকাতে অনেকসময় বৃহৎ চিত্ররচনায় তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সমুদ্র পর্ব্বতের ন্যায় প্রকৃতির বিরাট্ দৃশ্যে কবি যদি এই মুহূর্তে দৃশ্যের সমস্ত বৃহত্ত্ব চক্ষের সমক্ষে খাড়া করিয়া না তুলিতে পারেন, তবে যে চিত্রই ব্যর্থ হয়। কারণ, বিরাটত্বই তাহার প্রধানভাব; তাহার খণ্ড খণ্ড আংশিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে প্রাধান্য দিলে তাহার প্রকৃত ভাবটাকেই খর্ব্ব করা হয়।''[৬]

বৃহৎ ও খণ্ডচিত্র বর্ণনায় সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রথিতযশা কবি ভবভূতির সঙ্গে কালিদাসের প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> ''ভবভূতি যেখানে একটিমাত্র মেঘ মন্ত্র সমাসে বিন্ধ্যপর্ব্বতের অন্ধকার অরণ্য সম্মুখে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলেন, কালিদাস সেখানে প্রত্যেক লতার এবং ফুলের স্বতন্ত্র আস্বাদটুকু ছাড়িতে পারেন না।''[৭]

আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও এমন উপমা দেখতে পাই, যেখানে তিনি কালিদাস ও ভবভূতির তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন— ''মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়-উৎকটে ভবভূতি।''[৮]

কালিদাসের 'ঋতুসংহার' এর আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর অন্যান্য কাব্যের সঙ্গে এর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখিয়েছেন। প্রবন্ধের সূচনায় তিনি বলেছেন 'ঋতুসংহার কালিদাসের প্রথম রচনা' আর প্রথম হিসাবে এখানে দোষ ও গুণ উভয়েই বর্তমান। পাশাপাশি আবার ঋতুসংহারের সঙ্গে 'মেঘদূত' এর বিশ্বপ্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ঋতুসংহারে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য বেশি যা মেঘদূতের সঙ্গে তার পার্থক্য সূচিত করে। এ প্রসঙ্গে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> ''কিন্তু মেঘদূতের সহিত ঋতুসংহারের তাহা হইলে প্রভেদ কোথায়? মেঘদূতও ত আদিরস প্রধান খণ্ডকাব্য। আর সমস্তটাই বর্ণনা ও বটে। কিন্তু প্রভেদ আছে। মেঘদূতে মানবহৃদয়েরই প্রাধান্য। কালিদাস বিরহীর হৃদয়ে বসিয়া বর্ষার প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। ঋতুসংহারে বাহ্য জগতেরই প্রাধান্য।''[৯]

কালিদাসের কাব্যরূপের গদ্যরূপান্তরের মাধ্যমেই ঋতুসংহারের রস উপভোগের চেষ্টা করা হয়েছে।

'রত্নাবলী' প্রবন্ধটিতে বিশ্লেষণকে দূরে সরিয়ে রেখে নিছক বিবরণ দিয়েছেন। ফলে অন্যান্য প্রবন্ধগুলির মতো এটি বিশ্লেষণাত্মক না হয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিবরণাত্মক হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে তিনি চরিত্রগত কিছু বিবরণও দিয়েছেন। যেমন— উদয়ন চরিত্রের স্বভাব বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের প্রকাশ বর্ণনাকালে দুষ্মন্তের তুলনায় তাকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করেছেন। 'রত্নাবলী' নাটকের রাজা রাজকর্তব্য পালন অপেক্ষা অন্তঃপুরের কর্তব্য পালনের জন্যই উদগ্রীব। তাই প্রাবন্ধিক এ নাটকে রাজার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কখনও রামচন্দ্র কখনও বা দুষ্মন্তের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাই তিনি বলেছেন—

> ''রামচন্দ্রের মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সবল পুরুষচরিত্র ত কৈ, ইদানীন্তন রাজকুলে বড় একটা দেখা যায় না। রত্নাবলীর উদয়নের সহিত তুলনা করিলে দুষ্মন্তকে অনেক উচ্চ আসন দিতে হয়। তাঁহার

চরিত্রের একদিকে এমন তেজ বল ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে যে, কোমল প্রণয়ব্যাপারে রাজভাব কিছুমাত্র খর্ব হয় নাই। রত্নাবলীতে বৎসরাজের ক্ষমতার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই।"[১০]

কখন আবার প্রাবন্ধিক স্ত্রী চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মূলতঃ সকল চরিত্রেরই একটা সামগ্রিক বর্ণনা করেছেন। বলেছেন—

"রত্নাবলী নাটকে সাধারণতঃ যেসকল স্ত্রী চরিত্র দেখা যায়, সকলগুলিকেই বেশ সুচতুরা এবং কলাবতী বলিয়া বোধ হয়।"[১১]

অবশ্য চরিত্রগত এই অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা যুক্তিসহ বলে মেনে নেননি ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, তিনি এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

"নাটকে চরিত্রের (নায়ক হলেও) সর্বাঙ্গীন পরিচয় প্রকাশিত হবেই এমন নীতি নির্দেশের সার্থকতা নেই। বিশেষতঃ নাটক যখন জীবনের একটি বিশেষ দ্বন্দ্বময় দিককেই সংহত করে তখন চরিত্রের সর্বাঙ্গীন পরিচয় অপ্রয়োজনীয়।"[১২]

প্রবন্ধের শেষে বলেন্দ্রনাথ 'রত্নাবলী' নাটককে ট্রাজেডি কিংবা কমেডি কিংবা এ দুয়ের মধ্যস্থতায় স্থাপনে আপন মত ব্যক্ত করেছেন। চার অংকে সমাপ্ত এ নাটককে সঠিক কোন শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে সেবিষয়ে তর্কে যেতে চাননি, বরং রত্নাবলীর সাথে কখনও জুলিয়েটের ভাবসাদৃশ্যকে অনুভব করেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত যেহেতু রত্নাবলী মরতে গিয়েও মরতে পারেনি সেহেতু এটিকে সম্পূর্ণতঃ বিয়োগান্তক বলা যায় না। তবে ভারতীয় নাটকের আদর্শ অনুযায়ী এ নাটকে ট্রাজেডি যেন মিলনেই পরিসমাপ্ত হয়েছে। বলেন্দ্রনাথ 'রত্নাবলী'কে ট্রাজেডি বলেছেন একারণেই যখন—

"পরিচারিকা বৎসল্য বাসবদত্তা স্বামীর মঙ্গলোদ্দেশে রত্নাবলীকে যখন তাঁহার উত্তমার্দ্ধ করিয়া দিলেন....."[১৩]

এ ট্র্যাজেডি বোধহয় বাসবদত্তার অন্তর্গত ট্রাজেডি যা বাইরের নয়, এর প্রকাশ 'সাধ্বী পতিব্রতা বাসবদত্তার সহিষ্ণু হৃদয়ে'। অর্থাৎ মিলনদৃশ্যেও এখানে ট্রাজিকরস প্রবাহিত

হয়েছে যা বাইরের লোকেরা মহিষীর বাইরের হাসিমুখ দেখে অনুভব করতে পারবে না। অন্যান্য সমালোচনার তুলনায় রত্নাবলীর সমালোচনা একটু বেশি বিবরণাত্মক।

'মৃচ্ছকটিক' প্রবন্ধটির সমালোচনা অনেকটা 'রত্নাবলী'র সমগোত্রীয়। এখানে প্রাবন্ধিক রস উপভোগের চেষ্টা করেছেন কাহিনীর সম্যক বর্ণনার মধ্যদিয়ে অর্থাৎ এটিও মূলতঃ বিবরণাত্মক 'অন্তর্ভেদী' বিশ্লেষণ না থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচীন উজ্জয়িনীর সমাজচিত্র অঙ্কনে তৎপর হয়েছেন। যেখানে কালিদাসের নিসর্গ প্রেমিকতার স্নিগ্ধ মনোরম ছায়া পড়েনি। মানুষের চারপাশের জগৎ রচিত হয়েছে মূলত, 'সুসজ্জিত পণ্য বীথিকা', শ্রেণীবদ্ধ সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী' ও 'নিত্য উৎসবময় বিলাসভবনে'র অবস্থিতিতে। এরূপ বিলাসদৃশ্য বর্ণনার পাশাপাশি বিক্ষিপ্তভাবে গণিকাকন্যা বসন্তসেনার প্রতি তীব্র সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে কারণ এই গণিকাকন্যা 'নষ্টবিত্ত সম্ভ্রান্ত পৌরজনের গুণমুগ্ধ প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী'।

এখানেও বলেন্দ্রনাথ কালিদাসের সাথে শূদ্রকের বাস্তববোধ তুলনা করেছেন। কালিদাসে যখন কেবলি সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের স্ফূরণ ঘটা 'নাতিসুন্দর স্থূলদৃশ্য' বর্ণনা করেছেন, তখন বসন্তসেনার আলয়ে 'স্থূলাঙ্গী জননী' কে বার করেছেন শূদ্রক— যা কালিদাসে কখনই ঘটত না। বরঞ্চ সেক্ষেত্রে কলিদাস—

> ''...একেবারে নৃত্যগীত মদিরা উৎসব ও রূপসীগণের অর্ধ অনাবৃত চারু যৌবনের মধ্য দিয়া মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার বৃক্ষবাটিকায় লইয়া যাইতেন— যেখানে যুবতীগণের সনূপুর.....অনুভব করেন।''[১৪]

'মালবিকাগ্নিমিত্র' প্রবন্ধের আলোচনায় এ নাটকের সাথে শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকের কাহিনীগত ঐক্য নিরুপন করেছেন বলেন্দ্রনাথ—

> ''যে প্রণয়ব্যাপার রত্নাবলী নাটিকার মূল ঘটনা, মালবিকাগ্নিমিত্রেরও তাহাই। মহিষীর বৃথা সতর্কতা, নায়ক-নায়িকার অবস্থা, গোপন মিলন এবং তাহার ফলাফল, রাজার ভাবভঙ্গী, বিদূষকের কার্য্যাকার্য্য, শেষ অঙ্কে দুই চারিটা যুদ্ধজয় সংবাদ, রাজকর্ম্মচারি সমাগম এবং বাঞ্ছিত মিলনে উপসংহার উভয় গ্রন্থেই এক।''[১৫]

তবে তীব্রতা, সজীবতা এবং চতুরতা নাটকীয় এ সকলগুণে তিনি 'রত্নাবলী'র শ্রেষ্ঠত্বকেই স্বীকার করেছেন—

> ''রত্নাবলীতে সকল চরিত্রগুলিতেই সজীবতা ও চতুরতা বিশেষ পরিস্ফুট, মালবিকাগ্নিমিত্র নির্জ্জীব নহে, কিন্তু রত্নাবলীর চরিত্রে যেরূপ আবেগ ও উদ্যম দৃষ্ট হয়, মালবিকাগ্নিমিত্রে তেমন নয়।''[১৬]

সে তুলনায় বরঞ্চ 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' অনেকস্থলে কবিহৃদয়ের বিকাশ ঘটেছে। প্রবন্ধটিতে তিনি চরিত্রগত কিছু বর্ণনা করেছেন। মালবিকা কিংবা অগ্নিমিত্র ছাড়াও দুর্গপাল বীরসেন, কৌশিকী, ইরাবতী প্রভৃতির চারিত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। ফলে নাট্যবিশ্লেষণের পরিবর্তে নাট্যবর্ণনাই প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধের শেষে আবার বলেন্দ্রনাথ নাটকের রচয়িতা ও কালসমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন—

> ''তবে মালবিকাগ্নিমিত্রের গঠন তেমন পরিপাটি নহে বটে। সেই জন্যই আমরা কালিদাসের কাঁচা হাত বলিয়াছি। আর একটু গঠন পারিপাট্য হইলে মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা সম্বন্ধে সকল সংশয় দূর হইত। মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে বাস্তবিকই সন্দেহের উদয় হয় যে, বুঝি কালিদাস এ গ্রন্থের রচয়িতা নহেন। কিন্তু চতুর্দ্দিক মিলাইয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে সন্দেহ অনেকটা ঘুচে।''[১৭]

'জয়দেব' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ প্রথমতঃ প্রেমের স্বরূপটিকে উপলব্ধি করেছেন তাই নয়, তাঁর এই উপলব্ধ সত্যকে পাঠকের সামনে প্রকাশ করেছেন। প্রেম শরীর মন-আত্মাকে একত্রে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ—

> ''যখন হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন হয়, তখন শরীর দূরে পড়িয়া রহে না; তখন স্বততই বাহু বাহুর নিকট আকৃষ্ট হয়, কপোল কপোলে আসিয়া সংলগ্ন হইতে চাহে। দেহ মন আত্মা-একত্র হইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতে গেলে প্রেমকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। প্রেমের মধ্যে এই সকলই অত্যন্ত অবিচ্ছেদ্য ভাবে একীভূত হইয়াছে।''[১৮]

আবার উল্টোদিক থেকেও তিনি বিচার করেছেন—

> ''কিন্তু যাঁহারা শরীরকে হেয়জ্ঞানপূর্বক পূর্ব্ব হইতেই মনকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া প্রেমকে ধ্যানমাত্রে অভিব্যক্ত করিতে চাহেন। তাঁহাদের সে প্রেম আকারবিহীন নিষ্ফল।''[১৯]

আর এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন্দ্রনাথ জয়দেব ও তাঁর অমরসৃষ্টি 'গীতগোবিন্দ'-এর প্রসঙ্গ এনেছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমচিত্রকে অঙ্কন করতে গিয়ে জয়দেব তাঁদের প্রেমকে খণ্ডিত করেছেন, আর ক্রমেই তা অশ্লীল হয়ে উঠেছে। তাই—

> ''....জয়দেবের কবিতা ক্রমাগত কর্ণে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনক শব্দ বর্ষণ করিয়া যায়, কিন্তু কল্পনাপটে কোন চিত্র অঙ্কিত করেনা।''[২০]

'জয়দেব' প্রবন্ধে তাই বলেন্দ্রনাথ অভিযোগের সুরে বলেছেন—

> ''বিলাসকলা কুতূহলের তৃপ্তি জয়দেবের উদ্দেশ্য হলেও রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে যখন বিলাস সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তখন সেই বিলাসের মধ্যেই কৃষ্ণের প্রতি তন্ময়তা থাকা উচিত ছিল। পরবর্তী বৈষ্ণবকবিরা সম্ভোগ বর্ণনা কিছু কম করেননি, কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই সম্ভোগ স্বাভাবিকভাবেই আত্মিক অতৃপ্তির মধ্যে শেষ হয়েছে। প্রেম শরীর-মন- আত্মাকে একত্রে আকর্ষণ করে। জয়দেব প্রেমের এই অখণ্ডতাকে আঘাত করেছেন, খণ্ডিত করে দেখতে চেয়েছেন এবং সেইজন্যেই তা অশ্লীল। তাছাড়া এই খণ্ডিত দৃষ্টির সঙ্গে মিশেছে শুধু বৈচিত্র্যহীন ছন্দে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিজনক শব্দবিলাস।''[২১]

বলেন্দ্রনাথের এই বক্তব্য আমাদেরকে প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর 'জয়দেব' প্রবন্ধকে মনে করায়। উক্ত প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীও বলেন্দ্রনাথের মত জয়দেবকে নস্যাৎ করে বলেছেন—

> ''রাধাকৃষ্ণের প্রেম জয়দেবের কাব্যের বিষয় বলিয়া সাধারণের নিকট জয়দেবের কাব্য এত উপাদেয়.....সুতরাং জয়দেব যখন সেই যমুনা, সেই বাঁশি, সেই রাধা, সেই কৃষ্ণ ও সেই বৃন্দাবনের

কথা বলেন তখন তাহার পরিবর্তে তাঁহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকবিরা আমাদের মনে ঐ সকলের যে সুন্দর মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহারই দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। আমরা আসল কারণ না বিচার করিয়া মনে করি জয়দেবের কবিতা পড়িয়াই আমরা মোহিত হইতেছি। তাঁহার পরবর্তী কবিসকলের গুণ আমরা ভুলক্রমে জয়দেবে আরোপ করি।"[২২]

বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের কবি কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব প্রমুখের কাব্য সমালোচনা করেছেন। এবং তাঁদের প্রতিভার স্বরূপকে হৃদয়গ্রাহী করে প্রকাশ করেছেন। তবে কোথাও তিনি চির প্রতিষ্ঠিত সত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নি। 'জয়দেব' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন— ''কাব্যের দোষগুণ বিচার করাই সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য"[২৩] তাই কাব্য সমালোচনার আদর্শ 'জয়দেব' সম্পর্কিত আলোচনাটিতে জয়দেবের দোষগুণের কেন্দ্রস্থল দেখালেও 'গীত গোবিন্দ' যে প্রকৃত গীত— একথা তিনি অনায়াসে বলতে পেরেছেন। জয়েদেবের কোমলকান্ত পদাবলীর শব্দবিন্যাস এবং বিচিত্র ঝংকার যে গানেরই উপযুক্ত তা প্রাবন্ধিক পাঠককে বোঝাতে চেয়েছেন এবং অন্যদিকে দেখিয়েছেন 'বিলাস কলাবর্ণনপটু' কবির গীতের কোথাও প্রেমের অসীম স্বরূপ প্রতিভাত হয়নি। কেননা—

''সঙ্গীতে চিত্রবৈচিত্র্য এবং কল্পনা কৌশলের স্থান নাই, কেবল সাধারণভাবে একটি স্থায়ী রস অবলম্বন করা আবশ্যক। জয়দেব শৃঙ্গার রস আশ্রয় করিয়াছেন এবং এই রসকেই স্বরোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছেন।"[২৪]

বলেন্দ্রনাথের মতো প্রমথ চৌধুরীও জয়দেবকে শৃঙ্গার রসের কবি বলে স্বীকার করেছেন—

''শৃঙ্গার রসের বর্ণনায় জয়দেব যখন তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা প্রস্ফূটিত করিয়া তুলেন তখন তাঁহার কবিতা বিশেষরূপে স্বাভাবিক হইয়া উঠে— তখন তিনি কোনোরূপ অপ্রাকৃত কিংবা অযথার্থ কথা বলেন না।.....তাই শৃঙ্গাররস বর্ণনকালে তাহার ভাষা ভাবের অনুরূপ। তিনি শৃঙ্গাররসের কবি।"[২৫]

বলেন্দ্রনাথের বক্তব্য হল সাংগীতিক কারণেই এক রসকে অবলম্বন করতে হয়, সেখানে

রসবৈচিত্র্য আনা সম্ভব হয় না তাহলে সুরের ব্যাঘাত ঘটে কিন্তু প্রমথ চৌধুরী একথা মানতে চান নি।

বলেন্দ্রনাথ তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। সংস্কৃত কবি নাট্যকার ভবভূতি প্রণীত উত্তর রামচরিতের বেদনাবিহ্বল, করুণ মর্মস্পর্শী দিকটি বলেন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবনায় ও চিত্তাকর্ষক ভাষায়একটি নির্মল আনন্দরসের দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ভবভূতির কবি-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্য এবং মহাকবি কালিদাসের থেকে তাঁর দূরত্বও তিনি 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে ও সুকৌশলে পরিবেশন করেছেন। কালিদাস যেখানে মাধুর্য বিলাসিতায় মগ্ন, ভবভূতি সেখানে সুখ-দুঃখে বিবশ ব্যাকুল; তাই তাঁর মতে—

> ''ভবভূতির কাব্যে সুখও যেন অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়া অনেকটা দুঃখেরই মত হইয়া আসে।...কালিদাসের কাব্যে যেমন দুঃখও বিলাস অলসিত মোহন মধুরবেশে কতকগুলি সুন্দর চিত্রবদ্ধ হইয়া মোহ উদ্রেক করিয়া দেয়, ভবভূতির কাব্যে সুখ সেইরূপ মর্মস্থলে বেদনাবিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত করুণ ও নিবিড় হইয়া উঠে।''[২৬]

প্রথম অংকের আলেখ্য দর্শনের মধ্যে দিয়ে মিলনস্মৃতি, স্মৃতিযুক্ত সীতা রামচন্দ্রের মিলনের অনির্দ্দেশ্য আবেগ এবং তার পরই কুলগৌরব চেতন রামচন্দ্র সীতাগত প্রাণ রামচন্দ্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের নাট্যরসকে বলেন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরচরিতের আলোচনার আলেখ্যদর্শনের এই নাট্যিক তাৎপর্যকে যেন আরও গভীরভাবে অনুভব করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন আসন্ন সীতা বিচ্ছেদের রসকে ঘণীভূত করার জন্যই এই চিত্রদর্শনজনিত মিলনরসঘন দৃশ্যের সুখ দুঃখমিশ্রিত আচ্ছন্ন বিবশতার অবতারণা। অন্যান্য অঙ্কগুলির মধ্য দিয়ে আনন্দবেদনা মোহরস খচিত করুণরসের উৎসারকে বিবরণাত্মক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়েছে।

'উত্তরচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রখ্যাত সংস্কৃত সাহিত্য-সমালোচনা। 'উত্তরচরিত'-এর কলাশৈলীকে বঙ্কিমচন্দ্র কখনো শেক্সপীয়র, কখনো কালিদাস প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করে দেখেছেন। তাই তিনি প্রবন্ধে বলেন—

> ''কালিদাসের বর্ণনাশক্তি অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনা

শক্তিও উত্তম। কালিদাসের বর্ণনা তাঁহার অতুল উপমা প্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল;...ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত করেন না; যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন— কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলি ঘষেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া' পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।"[২৭]

আর শেক্সপীয়র ও ভবভূতির তুলনা দিয়েছেন এইভাবে—

''ভবভূতিও সেক্ষপীয়রের ন্যায় আপনক্ষমতার পরিমাণ জানিতেন। তিনি আপনাকে, সীতা নির্ব্বাসন বৃত্তান্ত অবলম্বনপূর্ব্বক একখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়নে সমর্থ বলিয়া বিলক্ষণ জানিতেন।"[২৮]

বলেন্দ্রনাথও তেমনি 'উত্তরচরিত' এর আলোচনাতে বায়রনের সঙ্গে প্রতি তুলনার কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধটিকে বিশ্লেষণমূলক ভঙ্গিতে বিচার করেছেন আর বলেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে কালিদাসের কলাকীর্তিকে হৃদয়াবেগের আর্তি নিয়ে বিচার করেছেন। মূলতঃ তাঁর দৃষ্টি অর্ন্তলোকে নিবদ্ধ ছিল। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বিচারক বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বরস চিন্তার মননদীপ্ত তুলাযন্ত্রে সংস্কৃত সাহিত্যের রসমূল্যের পরিমাপ করেছেন সেখানে কবি স্বভাবিত গদ্যশিল্পী বলেন্দ্রনাথ গড়েছেন পূর্বসূরীর পূর্বসৃষ্টির নববিশ্লেষিত রসমূর্তি। বলেন্দ্রনাথের যাত্রা বিশ্লেষণ ও আশ্লেষণের মধ্যপন্থায়।

সংস্কৃত সাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথের আগমন ঘটেছিল মহাকবি কালিদাসের অমরসৃষ্টি 'মেঘদূত'কে উপলক্ষ করে। রবীন্দ্রনাথ তখনও কালিদাস অনুভবের স্ফূর্তি ঘটাননি তাঁর কল্পনায় ও কবিতা ভাবনাতে। কালিদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের অনুরাগের সোপান নানাভাবে গড়ে উঠেছিল। ঠাকুরবাড়ীতে প্রতীচ্য

সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য সাহিত্যের বহুল চর্চা তাঁদের মনে রেখাপাত করেছিল। শৈশবেই ঠাকুরবাড়ীর সন্তানদের পক্ষে সংস্কৃতভাষা চর্চা অত্যাবশ্যক ছিল। সংস্কৃতভাষা আয়ত্ত করার জন্য সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণের পাঠ নিতে হত, ব্রাহ্ম মন্ত্র ও উপনিষদের শ্লোকগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে মুখস্থ করতে হত। রবীন্দ্রনাথ এই পরিবেশ থেকে বাদ যান নি। আর বলেন্দ্রনাথের স্কুলের শিক্ষার অনেকটাই সংস্কৃত কলেজে তাই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ কিয়দংশ বেশি।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মেঘদূত' রচনার আরম্ভের সময় তখনও রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত' নিয়ে লিখতে আরম্ভ করেননি। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল জৈষ্ঠ্য ১২৯৬ আর রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতাটি রচিত হয়েছিল ঠিক একবছর পরে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ আর 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'মেঘদূত' প্রবন্ধের রচনাকাল ১২৯৮, অগ্রহায়ণ। অর্থাৎ বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য হলেও ভারতীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য সন্ধানে তিনি রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর প্রাবন্ধিক চেতনার স্বাতন্ত্র্য ছিল বিষয়চিন্তা এবং তার বিন্যাসে। তাই বলেন্দ্রনাথ 'মেঘদূত'কে একভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আর রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত'কে কিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন তা আলোচনা করবো।

'মেঘদূত' প্রবন্ধটিতে জয়দেব, বিদ্যাপতি ইত্যাদি কবিদের সঙ্গে তুলনা করে মেঘদূতের শিল্পরূপের প্রশংসা করেছেন। তাই তিনি বলেন— ''মেঘদূত বিরহের কাব্য এবং বোধ হয়, বিরহের শ্রেষ্ঠ কাব্য। জয়দেব বল, বিদ্যাপতি বল, বিরহজ্বালা অনেকেই প্রকাশ করিয়াছেন, প্রকাশ করিতে সক্ষমও হইয়াছেন; কিন্তু কালিদাসের মত সংক্ষেপে অথচ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে বিরহীকে কেহ বাহির করিতে পারিয়াছেন বোধ হয় না।''[২৯] বর্ষাকালে বিরহের রূপটিকে গভীরতর করে দেখানোই যেন কবি কালিদাসের উদ্দেশ্য। বর্ষার প্রভাব মনোজগতের উপর কতটা প্রভাব ফেলতে পারে বলেন্দ্রনাথ 'মেঘদূত'কে আশ্রয় করে তারই স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। মেঘদূতের বর্ণনাভঙ্গিও লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সমস্ত পথ ও পরিবেশের বর্ণনায় যক্ষের বিরহ ভাবনারই প্রক্ষেপ ঘটেছে। সারা বছরের মধ্যে বর্ষার সময় বিরহের যন্ত্রণা প্রকট হয়ে ওঠে। পৃথিবীর সমস্ত প্রেমিক হৃদয় যেন যক্ষের বিরহের সঙ্গে মিলে যায়। তাই তিনি বলেন—

> ''অন্য ঋতুর বিরহে দিন কাটিয়া যায়, কিন্তু বর্ষার দিন আর কাটে না। মুহূর্ত্তকে তখন যুগান্তর বলিয়া মনে হয়— বিরহের বন্ধনের

সময় যেন গতিশক্তিহীন হইয়া পড়ে। কুবের শাপে অভিশপ্ত যক্ষ
তাই বুঝি, আষাঢ়ের প্রথমদিনে রামগিরি শিখরে শ্যাম মেঘ
দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছে না— তাহার মনে সম্মুখের দীর্ঘ
বিরহ দুঃখ উথলিয়া উঠিতেছে।"[৩০]

বলেন্দ্রনাথের এই বক্তব্য বিন্যাস কেবল কালিদাসের কাল কিংবা সমকাল এর বিরহ নির্দেশ করেই ক্ষান্ত থাকেনি। বিরহের যে 'অশ্রুলবণাক্ত জলরাশি' নানা কালকে নানা মানুষকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো ঘিরে রাখে, তাই প্রাবন্ধিক বর্ণিত করেছেন।

এখানে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি আলোচ্য। কারণ এই প্রবন্ধে মানবাত্মার এই রহস্যময় চিরবিরহের বিষয়ের একটি পূর্ণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন—

"আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি,সে আপনার মানস
সরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছি; সেখানে কেবল
কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো
পথ নাই।"[৩১]

আগেই উল্লেখ করেছি যে বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র প্রভাবিত হয়েও অনেকাংশেই ছিলেন স্বতন্ত্র। এখানেও তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো কোন তত্ত্ব উপস্থিত করেন নি। কালিদাসের বর্ণনাভঙ্গিও লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অলকার বিলাসচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে যক্ষকে যদিও সামনে রেখেছেন তথাপি শেষ পর্যন্ত বলেছেন—

"কালিদাস আদর্শ মনুষ্য খাড়া করিবার চেষ্টা করেন নাই, যক্ষের
প্রকৃত চিত্র আঁকিয়াছেন মাত্র। আরও মনে রাখিতে হইবে মেঘদূত
কালিদাসের সৃষ্টি বটে, কিন্তু যক্ষ তাঁহার সৃষ্টি নহে।"[৩২]

ছন্দ ও ভাষার গাম্ভীর্য ও অব্যর্থ ব্যঞ্জনাও লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই তিনি বলেছেন—

"মেঘদূতে ছন্দের কেমন একটি গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখা যায়।
বর্ণনার সঙ্গে ছন্দের বেশ মিল খাইয়াছে। ছন্দের সঙ্গে ভাবের
সঙ্গে, কথার সঙ্গে এইরূপ প্রাণে প্রাণে মিলন হইয়াছে বলিয়াই
মেঘদূত এত উচ্চ অঙ্গের কাব্য।"[৩৩]

প্রবন্ধের শেষে লেখক কালিদাসের সৌন্দর্য ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মেঘের চিত্র এঁকে মিলনসুখ অনুভব করার প্রয়াসকে প্রাচীন কবির মতো তিনিও গ্রহণ করেছেন। ফলে প্রবন্ধটিতে বলেন্দ্রহৃদয় 'মেঘদূত' এর কাঠামোর মধ্যে বারেবারে নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করেছে, নতুনরাগিনী ঝংকৃত করেছে, এক অভিনব ভাবলোক সৃষ্টি করেছে। লেখকের প্রার্থনা—

> ''কালিদাসের সৌন্দর্য্যে আমাদের হৃদয় যে প্রতিদিন নূতন নূতন আনন্দলাভ করিয়া তৃপ্ত হয়— তাঁহার সৌন্দর্য্য আমরা যেন দিনে দিনে উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারি।''[৩৪]

'মেঘদূত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিভাবনা অতীতচারণা করেছে। কালিদাসের কালের মধুরস্মৃতি সৌন্দর্য পিপাসু ভাবুক কবিচিত্তকে উদ্বেলিত করেছে। কালিদাসের যুগ ও জীবনস্রোতের প্রাচুর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথ বর্তমান দিনের 'ইতর কলকাকলির' মাঝখান থেকেই কালিদাসীয় যুগের সঙ্গে কল্পিত ভাবস্পর্শ অনুভব করেছেন। অতীত ইতিহাসের প্রাণস্পন্দনটুকু শুনতেই রবীন্দ্রনাথ উৎসুক, তাই উজ্জয়িনীর বহুল ঐশ্বর্য আর বিপুলা স্ত্রী তাঁর স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করেনি। বরং পুরবধূদের 'কেশসংস্কারধূপ' তাকে বিচলিত করেছে। তাই তিনি লেখেন— ''অন্ধকার রাত্রে যখন ভবন শিখরের উপর পারাবতগুলি ঘুমাইয়া থাকিত তখন বিশাল জনপূর্ণ নগরীর পরিত্যক্ত পথ এবং প্রচণ্ড সুষুপ্তি মনের মধ্যে অনুভব করিতেছি এবং সেই রুদ্ধদ্বার সুপ্ত সৌধ রাজধানীর নির্জনপথের অন্ধকার দিয়াকল্পিত হৃদয়ে ব্যাকুল চরণচেপে যে অভিসারিণী চলিয়াছে, তাহারই একখানি ছায়ার মতো দেখিতেছি।''[৩৫]

প্রাচীন ভারতের স্নিগ্ধ জীবনযাত্রা রবীন্দ্রনাথকে যেমন আনন্দ দিয়েছে তেমনি বর্তমানের সমস্যাজটিল জীবনযাত্রাও তাঁকে ব্যথিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে—

> ''ঐ রেবা সিপ্রা নির্বিন্ধ্যানদীর তীরে, অবন্তী বিদিশার মধ্যে, প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত, তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।''[৩৬]

আসলে সুদীর্ঘকালের ব্যবধান প্রাচীন ও বর্তমানের মানুষের মধ্যে বিরহ সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাই বর্তমানকালের মানুষের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে অবন্তীর নগর চত্বরে

বৃদ্ধদের উদয়ন গল্প রচনার দৃশ্য, সুপ্তসৌধ উজ্জয়িনীর অভিসারিণীর অভিসার, শিপ্রাতটবর্তী যুথীবনের পুষ্পনাবী নারীদের চিত্র। কখনও বা প্রাচীনকালের দিকে তাকিয়ে হৃদয় বিলাপরাশিতে ভরে যায়। প্রাচীনের এইসব দৃশ্যবলি মনের ওপর এত গভীর প্রভাব ফেলে যে মনে হয় এর সঙ্গে বর্তমান কালের মানুষের সংযোগ থাকা উচিত ছিল, যদিও তা আজ সম্ভবপর নয়। একমাত্র কল্পনার সাহায্যেই কালিদাসের সেই সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে যাওয়া সম্ভব। অতীত সৌন্দর্যলোক অলকা আর আমাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। অথচ আমাদের মধ্যে সৌন্দর্য পিপাসু বিরহ-বিধুর একটি হৃদয় আছে। সে হৃদয় অতীতের সেই কল্পলোকের জন্য অনন্তকাল কাঁদে। সেই অবাস্তব রমনীয় কল্পলোকের সঙ্গে কবির কাব্য আমাদের মিলিয়ে দেয়। এইভাবে আমাদের অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থতা লাভ করে। কবির ভাষায়—

> ‘‘আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে, অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান। কবির কল্যাণে এখন সেই অতীত কাল অমর সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে পরিণত হইয়াছে; আমরা আমাদের বিরহ বিচ্ছিন্ন এই বর্তমান মর্তলোক হইতে সেখানে কল্পনার মেঘদূত প্রেরণ করিয়াছি।’’[৩৭]

কালিদাসের অমরসৃষ্টি ‘মেঘদূত’ বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয় প্রাবন্ধিকের হাতে নবরূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক চেতনার স্বাতন্ত্র্য ছিল বিষয় চিন্তা এবং তার বিন্যাসে। তাই ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেখানে তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন বলেন্দ্রনাথ সেখানে বিরত থেকেছেন। তাই বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের আগে ‘মেঘদূত’ রচনা করলেও তা অপরিণত রচনা, পরিণতির পথে যতই তিনি অগ্রসর হয়েছেন ততই সংহত হয়েছেন। তাই বলা যায়, সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য ব্যক্তিত্বকে যে প্রভাবিত করেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপকরণে তাকে শক্ত করে তুলতেন— এটাই ছিল বলেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের সঙ্গে কিছুটা মিল থাকলেও তাঁর স্বাধীন চিন্তার প্রমাণ বিস্ময়ের উদ্রেক যে করে উপরের প্রবন্ধগুলি নিবিড় পাঠে তা বোঝা গেল।

তথ্যসূত্র

১। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'কাব্যে প্রকৃতি', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৫১

২। তদেব, পৃ. ৫১

৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য, 'শকুন্তলা', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা ১৩১৪, পৃ. ৩৯

৪। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'কাব্যে প্রকৃতি', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৫৩

৫। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রগ্রন্থাবলী, 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ১৪

৬। তদেব, পৃ. ১৫

৭। তদেব, পৃ. ১৫

৮। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমরচনাবলী, 'উত্তরচরিত', সুবোধ চক্রবর্তী (সম্পা.), কামিনী প্রকাশনালয়, কলিকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ১৬২

৯। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রগ্রন্থাবলী, 'ঋতুসংহার', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৩৯৬

১০। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রগ্রন্থাবলী, 'রত্নাবলী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৪১২

১১। তদেব, পৃ. ৪১০

১২। জোয়ারদার দেবদাস (সম্পা.), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ১৩১

১৩। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রগ্রন্থাবলী, 'রত্নাবলী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৪১৫

১৪। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রগ্রন্থাবলী, 'মৃচ্ছকটিক', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ২৯

১৫। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'মালবিকাগ্নিমিত্র', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৪২২

১৬। তদেব, পৃ. ৪২৪

১৭। তদেব, পৃ. ৪২৮

১৮। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'জয়দেব', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৩৬

১৯। তদেব, পৃ. ৩৬

২০। তদেব, পৃ. ৩৮

২১। তদেব, পৃ. ৩৮

২২। চৌধুরী প্রমথ, প্রবন্ধসংগ্রহ, 'জয়দেব', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা ২০০০, পৃ. ৩০

২৩। তদেব, পৃ. ১৭

২৪। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'জয়দেব', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৪০

২৫। চৌধুরী প্রমথ, প্রবন্ধসংগ্রহ, 'জয়দেব', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা ২০০০, পৃ. ২৯

২৬। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'উত্তরচরিত', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা-১৩৭২, পৃ. ১৭

২৭। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমরচনাবলী, 'উত্তরচরিত', সুবোধ চক্রবর্তী (সম্পা.), কামিনী প্রকাশনালয়, কলিকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ১৬২

২৮। তদেব, পৃ. ১৫৯

২৯। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'মেঘদূত', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা-১৩৭২, পৃ. ১৬৫

৩০। তদেব, পৃ. ১৬৩

৩১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য, 'মেঘদূত', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩১৪, পৃ. ১৬

৩২। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'মেঘদূত', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা-১৩৭২, পৃ. ১৬৬

৩৩। তদেব, পৃ. ১৬৬

৩৪। তদেব, পৃ. ১৬৯

৩৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য, 'মেঘদূত', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩১৪, পৃ.১৪
৩৬। তদেব, পৃ. ১৫
৩৭। তদেব, পৃ. ১৫

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি, চিত্র-ভাস্কর্য বিষয়ক প্রবন্ধ

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি, চিত্র-ভাস্কর্য বিষয়ক প্রবন্ধ

রোমান্টিক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সৌন্দর্যপিয়াসী। বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যসন্ধানী কবিমন পরিভ্রমণ করেছে ভারতবর্ষের তীর্থ পথে। কীট্‌সীয় দৃষ্টিভঙ্গি A thing of beauty is a joy for ever'-কে গ্রহণ করে প্রবন্ধকার তাঁর মানসদৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন অতীতের দিকে। এটাই ছিল ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক কবি-সাহিত্যিকের মানস-পরিক্রমা। বলেন্দ্রনাথও অতীতের ধূসর জগত সৌন্দর্য অভিসারে যাত্রা করেছিলেন। 'খন্ডগিরি', 'প্রাচীন উড়িষ্যা', 'কণারক', 'বারাণসী' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁর প্রাচীনত্বের মোহ ফুটে উঠেছে। এক্ষেত্রে তিনি দৃষ্টি ও শ্রুতিকে একীভূত করেছেন। অর্থাৎ এখানে মিশ্রণ ঘটেছে একাধিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি যা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে তাকেই লেখক এখানে প্রকটিত করেছেন আপন ছায়া স্মৃতি ঘেরা বর্ণনার মাধ্যমে। এ প্রবন্ধগুলিতে বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি প্রগাঢ় ঐতিহ্য নিষ্ঠাও চূড়ান্ত সীমায় আরোহন করেছে। নিছক তথ্য ও যুক্তি দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, গ্রহণ করেছেন ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স রসকে। আপন কালের সঙ্গে অতীতের যে ব্যবধান রয়েছে তাকে নিজস্ব ভাব ও ভাবনার দ্বারা সুনিবিড় ঐক্য দান করেছেন। উড়িষ্যার ঐতিহ্য ভাস্কর্য ও স্থাপত্য বলেন্দ্রনাথের মনে এক গভীর প্রভাব ফেলেছিল। আর এই প্রাচীন উড়িষ্যাকে কেন্দ্র করেই বলেন্দ্রনাথের অধিকাংশ ঐতিহ্যমূলক প্রবন্ধের সৃষ্টি। বলেন্দ্রনাথের উড়িষ্যার প্রতি এক অস্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। কারণ ভারতবর্ষের মধ্যে উড়িষ্যাই একমাত্র স্থান যেখানে মুসলমান নৃপতিগণের বিধ্বংসকারী আক্রমণের পরেও দেশের অপরূপ শিল্প-কীর্তি বিনষ্ট হয়নি এবং দেবমন্দিরের পাষাণে মস্‌জিদের প্রাচীর নির্মিত হবার সুযোগ মেলেনি। তাই হিন্দু ধর্মানুরাগী শিল্পরসিক বলেন্দ্রনাথ এই উড়িষ্যাকে কেন্দ্র করে 'প্রাচীন উড়িষ্যা', 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র' প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

শুধু বলেন্দ্রনাথ কেন, ভারতীয় পুরাকীর্তির শিল্প বৈভবের মূল্যানুসন্ধিৎসার সূচনা বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ থেকেই। তারও আগে বহু দেশী বিদেশী রসপিপাসু মণীষী এমন প্রচেষ্টায় অংশ নিয়েছিলেন, আর 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা (১৭৮৪) একই প্রবণতার

ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি। বাঙালী সাহিত্য রসিকদের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও (বঙ্কিমপূর্ব) ভারতীয় পুরাকীর্তির সিদ্ধ রসিক ছিলেন। বস্তুতঃ বলেন্দ্র-প্রবন্ধ 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র', 'কোণারক', 'বারাণসী', 'কণারক', 'প্রাচীন উড়িষ্যা', 'খন্ডগিরি' প্রভৃতি রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র ও তদুত্তর সাধনারই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। ইতিহাসের তথ্যস্তূপ থেকে জাতির প্রাণস্পন্দনকে যেন আবিষ্কার করেছেন বলেন্দ্রনাথ। প্রেম ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ উড়িষ্যার প্রাচীন আত্মাটিকে প্রাবন্ধিক আপন সৃষ্টির মায়াজালে আবদ্ধ করেছেন। বলেছেন—

> ''শুধু ধর্ম্মনহে, শুধু ব্রাহ্মণ্যের গর্ব্ব অথবা বৌদ্ধ সন্ন্যাসমাহাত্ম্য নহে, শুধু একটা বিপ্লবের ইতিহাস নহে; কিন্তু এই দেবমন্দিরের ভাস্কর্য্যে এ দেশের প্রশান্ত প্রাচীন সভ্যতার একটি অখণ্ড চিত্র, একটি সম্পূর্ণ মহিমা চিরদিনের মত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। পাষাণে খোদিত শত নারীমূর্ত্তির কত বিভিন্ন প্রকারের কেশবিন্যাস, কত বিচিত্র বেশভূষা, হস্তে কত বিস্মৃত প্রাচীন যন্ত্র, গঠনে কি মায়ামন্ত্র, ভঙ্গীতে কি অবলীলা মাধুরী।''[১]

উড়িষ্যার বিগত দিনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে লেখক দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। এ দীর্ঘশ্বাস গৌরবান্বিত অতীতের জন্য, আজ এসব মন্দিরের নিয়মিত ঘন্টাধ্বনিতে দশদিক মুখরিত হয়ে ওঠে না। চারিদিকে শুধুই নিস্তব্ধতা, নির্জনতা। এমন নির্জনতা হৃদয়কে বেদনার্ত করে তোলে। কিন্তু সে বেদনা অনুভব করবে তেমন মানুষ কই? বর্তমানের সাথে সে অতীতের সুগভীর পার্থক্য। বর্তমানে যা নিছক পাষাণমাত্র, অতীতে এ সবই ছিল চেতনাসমৃদ্ধ। তাই তিনি আক্ষেপজড়িত কণ্ঠে বলেছেন— ''...হে দূরাগত পান্থ, এইখানে আসিয়া একবার তোমার পূর্ব্বপুরুষের সমাজচিত্র দেখিয়া যাও।''[২] অবহেলিত এই সকল মন্দিরের দিকে তাকিয়ে তাই লেখকের সন্দেহ জেগেছে মনে। নির্দ্বিধায় নিজের মনে প্রশ্ন তুলেছেন—

> ''এই উৎকলীয়েরা কি সেই কলাকুশলদিগের বংশধর? ইহাদের পিতৃপুরুষেরাই কি স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে বিলাসকলার এমন অক্ষয় স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন?''[৩]

এইখানে শুধুই অতীতচারিতা কিংবা রোমান্টিক মনের পরিচয় নয়, আরও একটি বিষয় বেদনার ভাষায় রূপ পেয়েছে। তা হল লেখকের স্বদেশানুরাগ দুর্ভিক্ষপীড়িত উড়িষ্যার প্রান্তে দাঁড়িয়ে পরিত্যক্ত মঠ-মন্দিরের দিকে তাকিয়ে আপন দেশের ঐতিহ্যকে বাহবা জানিয়েছেন, অস্পষ্টতাকে ভেঙে ফেলেছেন অনায়াসেই— ভালবাসা দিয়ে এঁকে দিয়েছেন পুরনো দিনের অঙ্কিত চিরকালীন সত্যস্বরূপকে। যেখানে—

> ''মাল্য এখনও গ্রথিত হয়, কিন্তু তাহার সে পূর্ব্বাদর নাই, বীণা নীরব হইয়াছে; সুসঙ্গীতও বড় শুনা যায় না। উৎসবের সময়ে উড়িষ্যার গৃহে গৃহে শুধু এক অত্যন্ত বেসুরা সানাই প্রাণপণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সঙ্গীতের কলঙ্ক রটনা করে মাত্র।''[৪]

মন্দিরের দেশ উড়িষ্যা। উড়িষ্যার ঐতিহ্যময় পথে দাঁড়িয়ে লেখক নিমেষেই পৌঁছে গেছেন সুদূর অতীতের রাজ্যে। যেখানে প্রাচীন ভারতীয় চারুশিল্পের সম্যক প্রকাশ। এতো তাঁর তপস্যা। প্রাচীনত্বের সাধনার মগ্নহৃদয় কখনও বা মন্দিরের মনোরম সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি উড়িষ্যার ধর্মজীবনকেও স্বল্প পরিসরে গ্রথিত করেছেন। 'খণ্ডগিরি', 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র' প্রবন্ধ এরই সাক্ষ্য বহন করে—

''খণ্ডগিরির গুহাবলীতে এই প্রাচীন ধর্ম্মযুগের সমাধি''[৫] ব্রাহ্মণবাদ বৌদ্ধধর্মকে আত্মসাৎ করে সন্ন্যাস বাহুল্য হলে প্রাচীন ধর্মভাবনায় পরিবর্তন ঘটে। কিংবা ''পুরাণরচয়িতা উড়িষ্যার চারিক্ষেত্রে বিষ্ণুর চারিটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন:— কণারকে পদ্ম, পুরীতে শঙ্খ, ভুবনেশ্বরে চক্র এবং যাজপুরে গদা। বিষ্ণুদেব গয়াসুরকে বধ করিয়া গয়ায় স্বীয় পদচিহ্ন এবং উড়িষ্যার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আপন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম রাখিয়া যান। তন্মধ্যে চক্রক্ষেত্র ও গদাক্ষেত্র হর পার্ব্বতীর এলাকা। কিন্তু তাহাতে এ পর্য্যন্ত কোনও গোল উঠে নাই।

> ''এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সন্দেহ হয় যে, উড়িষ্যার বৌদ্ধধর্ম্মের একটু বিশেষ প্রভাব হইয়াছিল এবং হয় ত তাহারই ফলে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌরদিগের মধ্যে বিরোধ অন্তর্হিত হইয়া কালক্রমে অনেকটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে।''[৬]

তাই ''—এখানে ব্রাহ্মণ নাই, শূদ্র নাই, উচ্চ নাই, নীচ নাই, ক্ষুদ্র জাতি, ক্ষুদ্র মান, ক্ষুদ্র গর্ব্ব এ রাজ্যের নহে।''[৭]

এই সর্বলোকের, সর্বকালের দেবতার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন এবং বহুদূর প্রান্তের বহু সহস্র মানুষ যে পথ দিয়ে হেঁটে আসছেন সে পথের এক অতি রমণীয় চিত্র এঁকেছেন বলেন্দ্রনাথ। এ চিত্রের সঙ্গে পুরাতনকালের নিগূঢ় যোগসূত্র রচিত হয়েছে। অপরিচিত যেন অত্যন্ত পরিচিত হয়ে উঠেছে। তাই তিনি বলেন—

> ''সম্মুখে আম্রমুকুলিত ছায়াময় প্রাচীন পথ, কাঠজুড়ির বালুগহ্বর হইতে উঠিয়া পুরুষোত্তমের দ্বারা অবধি প্রসারিত। এই পথ বাহিয়া চিরন্তন মানব প্রবাহ নিশ্চল দেবতার দ্বারে আপন বেদনা জানাইতে আসে। মধ্যে মধ্যে ক্ষীণাঙ্গী বাসন্তী নদনদী পথের মাঝখান দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া মৃদু প্রবাহে বহিয়া গিয়াছে। দূরে মেঘের মত নীল শৈলশ্রেণী কখনও ছায়াসুপ্ত, কখনও রবিকিরণে উদ্ভাসিত।''[৮]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ভারতবর্ষের মধ্যে উড়িষ্যাকে বলেন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। হিন্দু ধর্মানুরাগী শিল্পরসিক বলেন্দ্রনাথ তাঁহার উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র প্রবন্ধে লিখেছেন—

> ''উড়িষ্যা এখনও মন্দিরের দেশ। রাজধর্ম্ম যখন যাহা প্রবল হইয়াছে, আপনার উন্নত মহিমা প্রচার করিতে অভ্রভেদী পাষাণ শির উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে এবং এইরূপে ভারতবর্ষের বিলুপ্ত প্রায় পঞ্চবিংশতি শতাব্দী ভিন্ন ভিন্ন দেবতার চরণতলে উৎসৃষ্ট হইয়া পুরাতন দিনের জীবন গৌরব রক্ষা করিতেছে। পুরীতে জগন্নাথ, ভুবনেশ্বরে শিব, যাজপুরে পার্ব্বতী, বিনায়কে গণেশ, কণারকে দেবতাহীন সূর্য্যমন্দির, খণ্ডগিরিতে পরিত্যক্ত বৌদ্ধ গুম্ফাবলী, নদীতীরে, গিরিশিখরে, সাগর বেলায়, যেখানে প্রকৃতি দেবী আপন সৌন্দর্য্য ঈষৎ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, সেইখানেই

নীল দিগন্তের গায়ে হয় দেবালয়, নয় অনুশাসন স্তম্ভ, নয় প্রাচীন প্রস্তর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে; সমস্ত উৎকলদেশ যেন দেবতার বিহারভূমি এবং মানবের তীর্থক্ষেত্র।"[৯]

ওড়িশার দেবক্ষেত্রে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ও সৌরবাদ মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের পরিবর্তে সমন্বয় ঘটেছিল। একই সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ব্রাহ্মণীকরণে কিংবা ব্রাহ্মণ্যের বৌদ্ধীকরণে ওড়িশায় হিন্দুধর্ম এক নবরূপে দেখা দিয়েছিল। অতীতমুগ্ধ রোমান্টিকতা আর স্বদেশপ্রেমিকতার যথার্থ মিলনে গড়ে উঠেছে 'বারাণসী' প্রবন্ধটি। এখানেও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কথা আছে; ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার উত্থান-পতনের গভীর সম্পর্ক সূচিত হয়েছে। তাই এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"যাহা হউক, এই নির্ব্বান ও প্রলয়ের সংঘর্ষে বহু মতের বহু সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে— এবং বারাণসীই সকলগুলির প্রধান সঙ্গমক্ষেত্র।.....এই সকল দেবতাসঙ্গমের মধ্যে আদিম কাল হইতে ধর্ম্মের ধারাবাহিক অভিব্যক্তির একটি ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যায়। এবং এইসূত্রে অন্যান্য অনেক প্রাচীন দেশের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয়। যেমন, লিঙ্গপূজাবলম্বনে প্রাচীন মিশরের সহিত ঘনিষ্ঠতা; সূর্য্যোপাসনাবলম্বনে প্রাচীন পারস্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা; এবং এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা অনুষ্ঠান অবলম্বনে বহুতর অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত সম্বন্ধ। একদিকে এই; এবং অন্যদিকে মানবহৃদয়ের ক্রমবিকাশের একটি সমগ্র সোপান পরম্পরা ইহারই মধ্যে নিহিত আছে। সুতরাং, যে দিক্ দিয়াই দেখ, বারাণসীতে আসিয়া বিপুল মানবসমাজের সহিত সম্বন্ধ সুদৃঢ় হয় এবং এই সনাতন সম্বন্ধ নিবন্ধনেই বারাণসীর গৌরব ভূ-ভারতে অদ্বিতীয়।"[১০]

এই শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে যে প্রবন্ধটি শ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবী করতে পারে অনায়াসে সেটি হল কণারক। প্রাচীন উড়িষ্যার শিল্পকীর্তির এক অবিস্মরণীয় নিদর্শন কণারকের সূর্যমন্দির, সৌন্দর্য সন্ধানী শিল্পী বলেন্দ্রনাথ কণারকের অনিন্দ্য রূপ ঐশ্বর্য নিকেতনে

প্রবেশ করেছেন এবং তন্ময়মুগ্ধ হয়ে গেছেন। 'কণারক' প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি সুনিপুন রেখাপাতের সাহায্যে অতীতের স্নিগ্ধ রূপ সজীব করে তুলেছেন। কণারকের অতীতকালীন অভিজাত ধর্মীয় মাহাত্ম্য, সূর্যমন্দিরের অনবদ্য ও অনিন্দ্য কারুকার্য এবং কলাবৈগুণ্যে বর্তমান শৈবালছিন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয়ের বর্ণনায় যে নিখুঁত চিত্ররূপের সৃষ্টি করেছেন তা থেকে রূপদক্ষ শিল্পী বলেন্দ্রনাথের রহস্য সন্ধানী শিল্পী মনের প্রকাশ পাওয়া যায়। বালির স্তূপে প্রোথিত অতীত ভারতের ধর্মমন্দির কণারকের বিলুপ্ত, গৌরবময় ঐতিহ্যের চিত্রটি সৌন্দর্যসাধক শিল্পীর তুলির টানে এক অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। একটি পরিত্যক্ত নির্জন দেবালয়কে ঘিরে বলেন্দ্র হৃদয় বিস্ময়ে মুগ্ধ। একই জায়গায় বসে বিলীয়মান পুরাতনকে তিনি বিচিত্ররূপে সজ্জিত করে তোলেন আর নির্জীব সজীবতা দান করেন। যেখানে একসময়—

> ''...কত লোকে কতদিন অন্তরের দারুণ নির্ব্বেদ লইয়া আসিয়াছে! সংসার পাছে কামনার উদ্রেক করে, পাছে কোন দিন স্ত্রীর মুখ দেখিয়া মোহ উপস্থিত হয়, সন্তানের মায়া কাটান না যায়, বৃদ্ধ পিতামাতার অশ্রুজল বন্ধনচ্ছেদনে বাধা দেয়, গৃহ স্ত্রীপুত্র পিতামাতা সমস্ত পরিজন পরিত্যাগ করিয়া লোকে দেবদ্বারে আসিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়াছে— হে দেবতা, রক্ষাকর, মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া দাও,..."[১১]

আর বহুকাল পরে

> ''....কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত; যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃত প্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে— এবং অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণ পান্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়। মনে হয়—
>
> ''যদুপতেঃ ক্ক গতা মথুরাপুরী
> রঘুপতেঃ ক্ক গতোত্তরকোশলা।"[১২]

বলেন্দ্রনাথের গভীর ঐতিহ্য প্রীতির স্পর্শ চিহ্নিত এই 'কণারক' প্রবন্ধটি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র' 'প্রবন্ধের অন্তগর্ত' মন্দির প্রবন্ধটি।

দুটি প্রবন্ধই ভারতবর্ষের অতীত গৌরবোজ্জ্বল দুটি বিশিষ্ট ধর্মমন্দির অবলম্বনকরে লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ভুবনেশ্বরের মন্দির উপলক্ষ্য করে ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য রসসম্মতভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—

> ''দেবতা দূরে নাই, গির্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ পাপপুণ্য মিলন বিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির। এই সজীব-সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোনো কালে নূতন নহে; কোনো কালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্তমান; অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সত্যতা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয়না— কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্যসত্য প্রকাশ পাইতেছেন।''[১৩]

দার্শনিক জটিল ধর্মতত্ত্ব কবির ব্যাখ্যায় সার্থক হয়ে উঠেছে। বলেন্দ্রনাথের মত এই প্রবন্ধে প্রাচীন ঐতিহ্যে বিমুগ্ধ রোমান্টিক কবির অশ্রুনিবিড় বেদনার্দ্র কণ্ঠ কোথাও ধ্বনিত হয় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন—

> ''ইহাতে যে ধ্যানচ্ছবি মনে আনে তাহাতে দেখিতে পাই যে, যে আমি ভোগ করিতেছি, ভ্রমণ করিতেছি, সন্ধান করিতেছি, সেই আমির মধ্যে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ স্তব্ধভাবে আবির্ভূত।''[১৪]

আবার তিনি প্রবন্ধের শেষে স্পষ্টভাবে বলেছেন—

> ''...পিতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত প্রতিবেশী, একজাতির সহিত অন্য জাতি, এককালের সহিত অন্য কাল, এক ইতিহাসের সহিত অন্য ইতিহাস দেবতাত্মা দ্বারা একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে।''[১৫]

কিন্তু বলেন্দ্রনাথের 'কণারক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত ধর্মীয় তত্ত্ব পাওয়া যায় না। কিন্তু বিগত দিনের কণারকের যে বৈভব আজ লুপ্ত তার কথা স্মরণ করে লেখক যে মর্মাহত তার প্রমাণ মেলে। বলেন্দ্রনাথের ওড়িশা ভ্রমণ ভিত্তিক তৃতীয় রচনা 'কণারক'। আর এই ওড়িশা ভ্রমণে তিনি সঙ্গে পেয়েছিলেন বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথকে। এগারো ফেব্রুয়ারি সপরিবার বিহারীলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ কটক থেকে পুরীতে গিয়েছিলেন। তার প্রমাণ মেলে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে লিখছেন—

> ''বিহারীলালেরা আমাদের এমন যত্ন করেন— ঠিক যেন ঘরের লোকের মতো... এমনকি বলুকেও অনেকটা বাগিয়ে আনতে পেরেছেন— সে বেচারা যদিও এখনো ক্রমাগত মাথা নিচু করে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া তো একরকম বন্ধ করেছে। ওকে যা খেতে বলেন তাতেই মাথা নাড়ে। ভাগ্যি ওঁরা দুজনে মিলে অনেক পীড়াপীড়ি করেন তাই মুখে দুটি অন্ন ওঠে। নইলে এতদিনে শুকিয়ে যেত।''[১৬]

আবার চোদ্দো ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরাদেবীকে লিখলেন— ''আমরা আবার আজ রাত্রে কণারকে সূর্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখতে যাচ্ছি।''[১৭] রবীন্দ্রনাথ তাঁর নোটবইতে ওড়িশা ভ্রমণের রোজনামচা রেখেছিলেন যা 'ছিন্নপত্রাবলী'র চিঠির সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায়। ওড়িশা থেকে বলেন্দ্রনাথ লেখার বিস্তর রসদ নিয়ে ফিরেছিলেন। ওড়িশা বিষয়ক তাঁর রচনাগুলির তথ্যও রবীন্দ্রনাথের নোটবইয়ের সঙ্গে মেলে। বলা বাহুল্য, মুদ্রণের আগে এই রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথ দেখে দিয়েছিলেন।

বলেন্দ্রনাথ 'কণারক (সূর্যমন্দির)' প্রবন্ধে যেমন লিখেছেন—'বৈরাগ্য ও বিলাস যেন দেবতামন্দিরে দুই দিক্ হইতে আসিয়া মিশিয়াছে— শুধু এ পিঠ ও পিঠ, শুধু ভিতর বাহির, শুধু দেহ মন। কণারকে এখন দেবতা নাই— এত কথা বলা খাটে না। কিন্তু সমস্ত প্রান্তর জুড়িয়া সেখানে এক নিশ্চল বৈরাগ্য বাসা বাঁধিয়াছে।''[১৮] অবনীন্দ্রনাথ ও একই বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন তিনি তেরোশো একুশের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা সবুজপত্রে 'গমনাগমন' শীর্ষক রচনায় বলেন—

> ''কোণার্কের অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে...চিরযৌবনের হাট বসিয়াছে।.... এখানে কিছুই নীরব নাই, নিশ্চল নাই, অনুর্বর নাই! পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজিয়ান অশ্বের মতো বেগে রথ টানিয়া, উর্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর পুষ্পিত কুঞ্জলতার মতো শ্যাম-সুন্দর আলিঙ্গনের সহস্র বন্ধে চারিদিক বেড়িয়া।''[১৯]

দুটি রচনাতেই তাঁদের প্রত্যক্ষ দর্শনের অনুভব লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এই সর্বলোকের, সর্বকালের দেবতার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন এবং বহুদূর প্রান্তের, বহু সহস্র মানুষ যে পথ দিয়ে হেঁটে আসছেন সে পথের এক অতিরমণীয় চিত্র এঁকেছেন বলেন্দ্রনাথ। এ চিত্রের সঙ্গে পুরাতনকালের নিগূঢ় যোগসূত্র রচিত হয়েছে। অপরিচিত যেন অত্যন্ত পরিচিত হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর শুধুমাত্র প্রাচীন কণারক অথবা দূরকালের উজ্জয়িনী নয়, আধুনিক বোম্বাই বা লাহোরের বর্তমান দৃশ্যপটের অন্তরালে রোমান্টিক ছায়াস্মৃতি প্রকটিত হয়েছে. প্রাবন্ধিক যাত্রা করেছেন রোমান্টিক অভিসারে। অত্যন্ত প্রাত্যহিক বস্তুকে তিনি কল্পনার রঙ ও রেখায় রূপসমৃদ্ধ করে তুলেছেন। আধুনিক বোম্বাই শহরকে কিংবা লাহোরকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তার ভাবছবি ভগ্নপ্রায় বিলুপ্ত নগরীর তুলনায় কোন অংশে কম রমণীয় নয়। এখানেও স্বপ্নের এবং স্মৃতির একটা আবেশ জড়িয়ে রয়েছে—

> ‘‘সমুদ্রের উপকূলে বৃহৎ বোম্বাইপুরী যেন পাশ্চাত্য শিল্পীর অঙ্কিত বিস্তীর্ণ পটের উপরে প্রাচ্য উপন্যাসের একখানি মায়াচিত্র। মালাবার শৈলশিখর হইতে তরুণ শ্যামিমা নামিয়া আসিয়া নিম্নভূমির নারিকেল তরুকুঞ্জে নিঃশব্দে মিশিয়া গিয়াছে এবং এই মোহময়ী প্রকৃতির নিবিড় কুঞ্জবনমধ্য হইতে সহস্র অভ্রংলিহ প্রাসাদশিখররাজি উঠিয়া বোম্বায়ের রবিকরদীপ্ত সমুদ্রবেলায় একটি চিত্রার্পিত রমণীয়তা অর্পণ করিয়াছে।’’[২০]

আর্য সমাজের কর্মোপলক্ষ্যে বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে পাঞ্জাবের যোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল— ‘লাহোরের বর্ণনা’ রচনাটি তারই প্রতিকৃতিমাত্র। যদিও রচনাটি অসমাপ্ত, তবুও বক্তব্যের অন্তর্নিহিত ভাবরূপটি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত। এখানেও ধূসর অতীতের মায়াবন্ধনে তিনি আবদ্ধ হয়েছেন বাগ্‌দাদের অসংখ্য বিস্তৃত দিন তাঁকে অতীতমুখী করে তুলেছে। এর সাথে মিশেছে বলেন্দ্রনাথের হৃদয়াবেগ। বর্তমান লাহোরের মধ্যে লেখক দেখেছেন আরব্য মরীচিকার ছায়া। তাই তিনি এই প্রবন্ধে বলেছেন—

> ‘‘পঞ্জাবের আতপ্ত আকাশপটে লাহোর সহরটি যেন আরব্যোপন্যাসের প্রাচীন খলিফাদিগের একটি অতি পুরাতন পরিত্যক্ত রাজধানী। হারুণ-অল-রসিদ্‌-শাসিত বোগ্‌দাদের সে

নিত্যোৎসবময় পুরাতন সমারোহ এখানে এখন দুর্লভ—রাজপথে ছদ্মবেশে খলিফারাও ভ্রমণ করেন না এবং নিত্যনিশীথে নূতন নূতন উপন্যাসসুলভ ঘটনাও সংঘটিত হয় না— কিন্তু তথাপি ইহার গম্বুজে মিনারে, তোরণে প্রাচীরে, গৃহদ্বারে অলিন্দে, বাটীর সম্মুখের বিচিত্র খোদিত গোল বারান্দায়, বাতায়নে গবাক্ষে, ইহার আঁকা বাঁকা অপ্রশস্ত রাজপথ ও অসংখ্য গলিপথে এবং এই সকল পথের বিচিত্রবেশী জনতায়.....খালিফী বোগ্‌দাদের কাহিনী মনে পড়ে, এবং নিরন্তর উৎক্ষিপ্ত ধূলিজালে ও অবাধ প্রচুর সূর্য্যকিরণে মনে যেন আরব্যমরীচিকার ছায়া ঘনাইয়া আসে।"[২১]

বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধালোচনায় একটা জিনিস ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে যে তাঁর রচনায় বিষয়বৈচিত্র্য। সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা বা বাংলাসাহিত্য নিয়েই সমালোচনা নয়, ললিতকলা সমালোচনাতেও সমান পারদর্শী ছিলেন। রচনানির্মিতির স্বতন্ত্র যে দৃষ্টির পরিচয় আমরা পাই তা মূলতঃ কলানুরাগ-সম্মিত। এ প্রসঙ্গে চারুকলাবিদ্যার প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের আগ্রহে চারুকলাবিদ্যার প্রথম প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে ১৮৫৪ খ্রীঃ বাংলাদেশে, 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট সোসাইটি' নামে। পরবর্তীতে এটিই কলকাতার সরকারি 'আর্ট স্কুল'-এ রূপান্তিরত হয়েছিল। এখানে প্রতীচ্য চারুশিল্পীরা ছিলেন শিক্ষক— য়ুরোপীয় কলাশিল্পে দীক্ষা গ্রহণ করতেন ভারতীয় তরুণেরাও।অবনীন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ প্রমুখেরাও এখান থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করতেন। আর রবীন্দ্রনাথের শিল্পের প্রতি আগ্রহ ছিল আযৌবন, তাই তিনিও একই অভিন্ন পথে হেঁটেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ স্মৃতি রোমন্থন করে এক স্থানে বলেছেন—

"'খুব ছেলেবেলায় দেখতুম, বিলাতি ছবির প্রতিলিপি টাঙানো থাক্‌তো দেয়ালে।...তারপর এল রবিবর্মার যুগ। বিলাতি ছবি ফেলে দেওয়া হল, রবিবর্মার ছবির বড়ো বড়ো ওলিওগ্রাফ প্রিন্টে দেওয়াল গেল ভরে। বিলাতি ঢঙের আঁকা এই ছবিগুলিও বেশিদিন ভালো লাগ্‌ল না।..."[২২]

আর এই রবিবর্মার ছবি বলেন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। এই ছবির ভারতীয়তায় তিনি মুগ্ধ ছিলেন। তাই তিনি ১৩০০ বঙ্গাব্দে 'রবিবর্মা' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। এছাড়াও 'হিন্দু দেবদেবীর চিত্র', 'দিল্লীর চিত্রশালিকা', 'দেয়ালের ছবি', 'রঙ ও ভাব' প্রভৃতি রচনাগুলি কলা সমালোচকের বিশিষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষরবাহী। তবে এ বিষয়েও তাঁর প্রধান প্রেরণা ছিল চিত্র বিষয়ের পৌরাণিক মহিমা। ভারতবর্ষীয় সৌন্দর্য বিচারের প্রতিই তিনি মুগ্ধ ছিলেন। 'হিন্দু দেবদেবীর চিত্র' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

> ''দেবতাপ্রিয় ভারতবর্ষীয় কল্পনা বহিঃপ্রকৃতি ও মানবচরিত্রে যেখানে যে সৌন্দর্য্যটুকু অনুভব করিয়াছে, তাহাতে একটি নির্দিষ্ট গঠন দিয়া নিঃশব্দে আপন দেবতা গড়িয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য ভারতবর্ষের পৌরাণিক দেবভূমিতে আসিয়া হৃদয় যেমন পরিতৃপ্ত হয়, এমন আর কিছুতে নহে। গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্ত্তির অতুলনীয় দেহসৌন্দর্য্য হয়ত আমাদের দেবলোকে সর্ব্বত্র তেমন সুলভ নহে, কিন্তু এই সকল দেবমূর্ত্তিতে আমাদের অন্তরের বহু গভীর আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষের অনাবিল অন্তরতম অন্তর সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে।''[২৩]

এই 'অন্তরতম অন্তর সুন্দর'ই বলেন্দ্রনাথের আন্তরিক উৎস। কখনও বা দেবদেবীর চিত্রাঙ্কনে মানবীয় জীবনব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সৌন্দর্য সাধক বলেছেন—

> ''...এই মৃত্যুই মর্ত্ত্যের প্রধান সৌন্দর্য্য—পৃথিবীর সকল সুখদুঃখ বেদনা আনন্দের চরম পরিণাম এই যে সকলই আছে, অথচ সর্ব্বদাই হারাইবার ভয়, এই যে নশ্বরতা, ইহাতেই ইহলোকের সকল সুখ দুঃখ নিহিত। দেবলোকে যদি এই মৃত্যুই না রহিল, তবে দেবতাদের সুখদুঃখের সহিত আমাদের সুখদুঃখের সম্বন্ধ কিসের? ভারতবর্ষীয় হৃদয়, সুতরাং অমরধামেও মৃত্যুর ছায়া রচনা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সতীর দেহত্যাগে ও রতিপতির অনঙ্গীকরণে এই মৃত্যুরই অনুরূপ চিত্র সূচিত হইয়াছে।''[২৪]

আবার বাঙ্গলার চিত্রশিল্পের রূপ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> ''...বাঙ্গলার চিত্রশিল্পে রূপ যে কোথায় প্রছন্ন থাকে, তাহা দেবতারাও জানেন না। সৌন্দর্য্য উন্মেষিত করিতে পারিলে স্থলবিশেষে প্রচলিত আদর্শের অনুসরণ করিয়াও চিত্রকর আপন গৌরব রক্ষা করিতে পারিতেন। তাহাতেও ত বিশেষ একটা ভাবের বিকাশ থাকিত। এবং সেইভাবের গুণে সংস্কৃত আদর্শ হইতে অল্পবিস্তর বিচ্যুতি কাহরও নিকট তেমন মারাত্মক বলিয়া বোধ হইত না। চিত্রকর যে ভাবেই চিত্রিত করুণ, ভাবটি চিত্রে পরিস্ফূট করিয়া তুলিতে হইবে; এবং চিত্র যেন কোথাও অসঙ্গত না হয়।''[২৫]

বলেন্দ্রনাথ যখন মাঘ মাসে 'হিন্দু দেবদেবীর চিত্র' প্রবন্ধটি রচনা করেন তখনও মূর্তি লক্ষণ ও মূর্তিতত্ত্ব নিয়ে বিশেষ তথ্য উদ্ঘাটিত হয় নি এবং জর্জ বার্ডউডের মতো কয়েকজনের অসম্পূর্ণ বিকৃত রচনাই হিন্দু ধর্মভিত্তিক শিল্পকলা-পরিচয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল, সে-সময় বলেন্দ্রনাথই এই নিবন্ধে দেখিয়েছিলেন যে শাস্ত্র ও উপাখ্যানের দেবরূপ কল্পনার সমান্তরালে গড়ে ওঠা লোককান্ত মঙ্গলকবির কাব্যের লৌকিক দেবরূপকল্পনাই বাংলার দেবদেবী নির্মাণে সক্রিয় থেকেছে। কলকাতার আর্ট স্টুডিয়ো থেকে দেবদেবীর যে ছবি প্রচারিত হচ্ছিল সেগুলিতে 'প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শের সৌন্দর্যটুকু ক্ষুণ্ণ' হয়েছে বলে তিনিই প্রথম মন্তব্য করেন। তাঁর অনেকপরে রবীন্দ্রনাথ এবং E.B.HAVEL প্রমুখেরা একই মন্তব্য করেন। বলেন্দ্রনাথের এই নিবন্ধ অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বাংলা চিত্রাঙ্কনের দেবরূপকল্পনা সংশোধনে সহায়ক হয়েছিল। বিশেষ করে, শিবের রূপায়নে নন্দলাল মঙ্গলকাব্য ভাবনা পরিহার করে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রের অনুসরণে প্রাণিত হয়েছিলেন যৌথভাবে বলেন্দ্রনাথ ও অবীন্দ্রনাথের প্রভাবে। অবনীন্দ্রনাথও যে তাঁর ভাইয়ের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হননি তা অস্বীকার করা যায় না।

'দিল্লীর চিত্রশালিকা' বলেন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা যেখানে লেখক হৃদয় অতীতচারী। অতীত পৃথিবীর বাদ্‌শাহী আমলের বিলাসবর্ণনা করেছেন তিনি এই প্রবন্ধে। বিস্মৃতির অবগুণ্ঠণে ঢাকা পড়লেও ভারতবর্ষের কত শত রূপময় ছবি প্রাবন্ধিকের অনন্য

সাধারণ ব্যাখ্যার গুণে আমাদের দৃষ্টিতে যেন মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। তাঁর কথার গুণে, গদ্যরীতির আভিজাত্যে বিলুপ্ত নগরীর স্মৃতি নতুনতর রূপ লাভ করেছে। বলেন্দ্রনাথ একটার পর একটা পাতা উল্‌টেছেন আর পাঠককুল যেন এক প্রাচীন প্রাচ্য চিত্রকলার মহৎ রূপের সন্ধান পেয়েছে। ভারতবর্ষীয় রূপের তীর্থে শিল্পী যেমন পরিভ্রমণ করেছেন অবিরত, তেমনি আমরাও সেই রূপের পথেই হারিয়ে গেছি বারবার। রাজকীয় বর্ণনা করতে গিয়ে শিল্পীর গদ্যরীতিও যেন রাজকীয় হয়ে উঠেছে—

> ''চিত্রিত প্রাসাদকক্ষে যেরূপ ঘননিবিড় কোমল বিচিত্রাভপুষ্পিত পারস্য গালিচার উপরে উষ্ণীষশোভিত শির সুদীর্ঘচাপকাননিবদ্ধবপু রাজসভাসদ্‌গণের আসন নির্দিষ্ট হইয়াছে, ঐরূপ পুরু খাপী কুসুম সুকুমার স্পর্শ নানা পুষ্পলতাবিচিত্র গালিচার উপরে কনককারু খচিত আমেদাবাদী কিংখাবের গেলাপমণ্ডিত গুটিকতক সুগঠিত গভীর আরাম-উপাধান বৈ আর বড় কিছু থাকিবে না। এবং লাক্ষাবিলোপচিত্রিত সহস্র বর্ণের আভানিস্যন্দী ছাদহর্ম্ম্যতলে দন্তিদন্তখচিত আদ্যন্তখোদিত চন্দনপাদপীঠোপরি জয়পুরী কারুকার্য্যময় সুবর্ণদীপাধানে সুগন্ধী স্নেহাভিষিক্ত বর্ত্তিকাশিখামুখ হইতে ধূপধূম্রগন্ধবৎ একপ্রকার লঘু স্নিগ্ধ সৌরভ উত্থিত হইয়া দিকে দিকে মৃদু অনুকূল মোহ সঞ্চারিত করিতে থাকিবে।''[২৬]

এই বর্ণনার গুণে বহু দিনসুপ্ত সৌন্দর্য জেগে উঠেছে ভারতীয় শিল্পের গৌরব সূচিত হয়েছে। বর্ণনার ধ্বনিগৌরব এবং চিত্রধর্মিতার খুব সহজেই লেখক হৃদয়ের আত্মিক যোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটি তাঁর ভাব-বিভোরতা। পৃথিবীর এইসব দুর্লভ রূপের সন্ধান করেছেন তিনি। 'দেয়ালের ছবি' ও 'দিল্লীর চিত্রশালিকা'-এ দুটি প্রবন্ধে ভাব এবং রূপগত মিল আছে। সৌন্দর্য পিপাসু তরুণের চোখে পৃথিবীর রূপ যেন মায়াজাল পরিয়ে দিয়েছে। এমনকি প্রাবন্ধিক নিজেই সেকথা স্বীকার করে বলেছেন—

> ''এই ছবিগুলি দিয়া আমার মনের মধ্যে জগতের মায়াময়ী ছায়াপুরী রচনা করিয়াছি। বসিয়া বসিয়া দেখি, আর আমার মনের মধ্যে ইহারা জীবন্ত হইয়া উঠে, ছায়ার মত আসে যায়, বিচরণ

করে। আমি ইহাদের সুখ দুঃখ বেদনা মধ্যে আপনাকে বিস্মৃত হই।"[২৭]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বলেন্দ্রনাথের লেখার রসদ বেশীরভাগ এসেছিল ওড়িশা থেকে। ওড়িশার মন্দির বা যা কিছু স্থাপত্য ছিল তা সবই বলেন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করে। মধ্যযুগে উত্তরভারতে স্থাপত্য শিল্পের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিতে গেলে যে তিনটি ঘরাণার কথা মনে হয় সেগুলি হল— উড়িষ্যা ঘরাণা, বুন্দেলখণ্ড ঘরাণা এবং গুজরাট ও দক্ষিণভারত ঘরাণা। আর এই তিনটি ঘরাণার শিল্পকর্মই সবচেয়ে ভালোভাবে সংরক্ষিত হয়ে আছে। উড়িষ্যা ঘরাণার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময় জুড়ে। এই ঘরাণার শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কর্মগুলি ছড়িয়ে আছে ভুবনেশ্বরে, পুরীতে এবং দুটি শহরের কাছাকাছি অঞ্চলে। উড়িষ্যাতে সবচেয়ে সুন্দর মন্দির বলতে বোঝায় ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির। উত্তর ভারতের স্থাপত্য শিল্পে 'শিখর' যে বিকাশের কোন চরম মাত্রাতে পৌঁছেছিল তা আমরা জানতে পারি এই বিখ্যাত মন্দিরটি দেখলে।

বাইরের অলঙ্করণের ব্যাপারে দরাজ ও মুক্তহস্ত ছিলেন উড়িষ্যার স্থপতিরা। যে সব স্থাপত্য-কীর্তি তাঁরা রেখে গেছেন তা খুবই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু তাদের হাতে গড়া মন্দিরগুলির অভ্যন্তরভাগ নিরাভরণ। বড়ো বড়ো মন্দিরগুলির ছাদ মূল দেয়াল ছাড়িয়ে প্রসারিত কড়ি বা দেয়াল থেকে কতকটা বেরিয়ে আসা চৌকোণা অংশের উপরে ভর করে প্রসারিত। এ কাজের জন্য থামের ব্যবহার তাঁরা বড়ো একটা করেননি। ছাদ ধরে রাখার কাজে অংশত সাহায্য করতে দেখা যায় লোহার কাঠামোকে। এটি নিঃসন্দেহে এক লক্ষণীয় কারিগরী উদ্ভাবন।

উড়িষ্যার মন্দিরগুলির ভিতর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল পুরীতে বিষ্ণু-জগন্নাথের মন্দির যা আজও ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত দেবস্থানগুলির একটি— এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত কোণারকের 'কৃষ্ণ প্যাগোডা'। শেষোক্ত দেবস্থানটি সূর্যমন্দির। এটি একদা ভারতের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে অপরূপ মন্দিরগুলির অন্যতম ছিল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চেয়ে এ মন্দির আকারে অনেক বড়ো ছিল। দুশো ফুটেরও অধিক উচ্চতাসম্পন্ন এর চূড়া ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল অনেকদিন। কিন্তু এর সভাকক্ষটি আজও বর্তমান। ১২০০

শতাব্দীতে উড়িষ্যার গঙ্গবংশী রাজা লাঙ্গুলা নরসিংহদেব, ১২০০ শিল্পীদের কঠিন পরিশ্রমে ১২ বছর ধরে ১২ বছরের রাজস্ব খরচা করে এই মন্দিরের কাজ সমাপন করেছিলেন। এই মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছিল একটি রথের মত। যাতে ২৪টি অলঙ্কার সজ্জিত চক্র বর্তমান। প্রতি চাকার ৮টি খাডি (Spoke) আছে।

মন্দিরের প্রবেশপথে পৌঁছাতে গেলে অতিক্রম করতে হবে এক সশস্ত্র সোপানশ্রেণী। তার দুদিকে সারি সারি ছুটে যেতে উদ্যত অশ্বের মূর্তি। প্রত্যেকটি ঘোড়া লম্বায় ১০ ফুট এবং প্রস্থ ৭ ফুট। এখন এই 'ঘোড়া' উড়িষ্যা সরকারের সরকারী মোহরভাবে ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত ভাস্কর্য এটাই প্রমাণ করে যে সূর্যদেব চলেছেন তাঁর রথে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত পথ ধরে। মন্দিরের প্রাঙ্গণ সুশোভিত অতীব বলিষ্ঠ ও সুন্দর ভাস্কর্য্যের নিদর্শন দিয়ে। দ্বিধাহীন শৃঙ্গাররসের যে অসাধারণ সব মূর্তি রয়েছে কোণারকের স্থাপত্যে তাতে 'কৃষ্ণ প্যাগোডা'র খানিকটা কুখ্যাতি যে রটেছে তাতে সন্দেহ নেই। মৈথুনরত নরনারী আলিঙ্গনাবদ্ধ, এমন কি সংগমে মগ্ন অবস্থাতে রয়েছে এমন পাষাণমূর্তি ভারতের বহু মন্দিরেই দেখা যায়। কিন্তু কোণারকের এই মূর্তিগুলি অসাধারণ প্রাণবন্ত। এই মিথুন মূর্তিগুলির প্রকৃত তাৎপর্য কি তা নিয়ে নানারকম অনুমান প্রচলিত। এমন অনুমান করা হয়েছে যে মূর্তিগুলি নেহাতই জাগতিক। মন্দিরের দেবদাসীদের দৈহিকরূপ ও আকর্ষণ বিজ্ঞাপিত করতেই এই আয়োজন। আবার কেউ বা অনুমান করেছেন যে মূর্তিগুলি আধ্যাত্মিক জগতের বিপরীতে রক্ত মাংসের জগৎ যে দুর্বার আকর্ষণে মানুষকে টানে তার কথা বলতে চায়। আধ্যাত্মিক জগতের প্রকাশ মন্দিরের অভ্যন্তরে যেখানে অলংকরণ নেই, আছে শুধু নিরাভরণ সরলতা। যৌনতাকে কেন্দ্র করে যে অতীন্দ্রিয়বাদ মধ্যযুগে ভারতীয় ধর্মভাবনায় বৃহৎ ভূমিকা নিয়েছিল কোণারকে হয়তো তারই প্রকাশ। অথবা এমনও হতে পারে যে মিথুন-মূর্তিগুলি স্বর্গের আনন্দ তুলে ধরেছে মর্ত্যের ভাষায়। সম্ভবত কোণারকের মন্দির তন্ত্রসাধনার একটি কেন্দ্র ছিল। তবে শৃঙ্গার রসাত্মক যে ভাস্কর্য কোণারকে দেখি তা কিন্তু শাক্তদের গম্ভীর ও কঠোর অনুষ্ঠানের তুলনায় সহজ ও বাধাবন্ধনহীন মানসিকতার ইঙ্গিত দেয়। এই কোণারক মন্দিরের ভাস্কর্য স্বভাবতই বলেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে। তাই তিনি বলেন—

''বিলাসকলার তখন ত্রুটি ছিলনা। মন্দিরের সমস্ত ভিত্তি পূর্ণ

করিয়া নগ্ন নারীমূর্ত্তি— বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ও সুডোল গঠন অনেক স্থলে শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক এবং অধিকাংশ স্থলেই অত্যন্ত কুৎসিত কল্পনায় শিল্পগৌরব সঙ্কুচিত।...উড়িষ্যার দেবমন্দিরে নর্ত্তকীর প্রাধান্য এখনও বড় কম নহে। জগন্নাথের পবিত্র নিকেতনে এখনও নিত্য রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয় এবং পাণ্ডাবর্গের পুণ্যসঞ্চয়ের তাহাতে কোনও ব্যাঘাত ঘটে না।"[২৮]

তাই বলা যায় এই মন্দিরগুলি বিবেচিত হত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে। মন্দিরের দেয়ালে ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হত সব দেবতাকে এবং স্বর্গ ও মর্ত্যের সবকিছু। হিন্দু সভ্যতার মতোই হিন্দুমন্দিরগুলি ছিল একাধারে তরল ইন্দ্রিয়বিলাস ও কঠোর আত্মসংযমের সমাহার। তার মূল ছিল মর্ত্যে নিহিত, তার অভীপ্সা ছিল স্বর্গাভিমুখী।

উড়িষ্যার ভাস্কর্য শিল্পী বলেন্দ্রনাথকে তাই গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ভুবনেশ্বর ও কোণারকের মন্দিরে খোদাই-এর কাজ বলে দেয় যে মানুষের দেহ সম্বন্ধে শিল্পীদের মনে কি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। আর বলে দেয় এমন এক প্রকাশ ক্ষমতার কথা যা তাদের দিয়েছে এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। উড়িষ্যা ভাস্কর্য শিল্পের সুন্দরতম প্রকাশ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি কোণারকের সূর্যমন্দির-প্রাঙ্গণের। শক্তিতে ভরপুর অশ্বগুলি এবং প্রচণ্ড সেই হস্তী যা শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে চূর্ণ করেছে দুষ্কৃতিকে— এরা এক বলিষ্ঠ ও অনুপম শিল্পপ্রয়োগের উজ্জ্বল উদাহরণ। আর এই জন্তুগুলি বহন করছে এক বিশেষ তাৎপর্য।

জন্তুর দেহ সম্বন্ধে এমন নিবিড় অনুভূতি পৃথিবীর তাবৎ শিল্পে একান্ত দুর্লভ। এরা মনে করিয়ে দেয় চীনের তান্ রাজবংশের আমলে জন্তুর দেহকে বিষয়বস্তু করে পাথরের ও চীনেমাটির যে অপরূপ কাজ হয়েছিল তাদের কথা। আর এই অপরূপ রূপেই মুগ্ধ হয়েছিলেন রূপসাধক প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথ।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে স্বল্পস্থায়ী সাহিত্য জীবনে তিনি সমাজ ও সাহিত্যের নানা বিষয় অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যেমন চিত্র শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ, দেশীয় প্রথা ও আচারমূলক প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক স্থান মাহাত্ম্যসূচক প্রবন্ধ ইত্যাদি। তাঁর প্রবন্ধ ভাবের

প্রাচুর্য ও বিষয় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তাঁর শিল্পদৃষ্টির মধ্যে সর্বত্রই এক অখণ্ডতা, বিরল সৌন্দর্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। এরকমই এক অমূল্য রচনা 'শুভ উৎসব'।

বাঙালী হিন্দুর যুগপ্রচলিত বিভিন্ন উৎসবের প্রেরণা ও প্রকৃতি সম্বন্ধেও বলেন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে বিচিত্র উৎসব তার কৌলিন্য হারাচ্ছে। যন্ত্র সভ্যতার যুগে উৎসবের অনাবিল আনন্দ ও ঔদার্য গুণ ক্ষুণ্ণ হয়ে তা আপিসি ছাঁচে পরিণত হয়ে গেছে। তাই উৎসবের মধ্যে আড়ম্বর থাকলেও আন্তরিকতা লুপ্ত হতে বসেছে। উৎসবের মূল কথা হল মানুষের পারস্পরিক কল্যাণী ইচ্ছা। এখন যে সম্বন্ধটা প্রকট হয়ে উঠেছে তা হল আর্থিক সম্বন্ধ, পূর্বেও যে এটা ছিল না তা নয়, কিন্তু এখন যেভাবে প্রকট হয়ে উঠছে তাতে আনন্দের পরিমাণ কম। তখনও ব্রাহ্মণ দক্ষিণা না নিয়ে বাড়ি ফিরতেন না, কিন্তু দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক থাকত। এমনকি কামার-কুমোর, ধোপা, নাপিত, হাড়ি, ডোম সকল জাতিই উৎসবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ দিত। মর্যাদানুসারে প্রত্যেককেই উৎসবের নির্দিষ্ট অঙ্গ বলে মনে করা হত। কিন্তু ইংরেজি কালচারের ফলে যান্ত্রিকভাবেই অনেক কাজ নিঃশব্দে হয়ে যায় ফলে সজীব মনুষ্যত্বের স্থান পাওয়া যায় না। বলেন্দ্রনাথ উৎসবের সার্বজনীনতা ও মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে তাই বলেছেন—

> ''আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই, তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি— এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ।... সাবিত্রীব্রত, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জামাতৃষষ্ঠী উপলক্ষ্যে আপন প্রিয়জন ও স্নেহাস্পদগণকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া নিজেকে ধন্য মনে হয়। বিধাতা আমাকে যে এত সৌভাগ্য সুখ দিয়াছেন, ইহা সকলের সহিত বন্টন করিয়া না লইলে ইহার সফলতা কোথায়? উৎসব ইহারই উপলক্ষ্য। সেই জন্য আমাদের উৎসবে ভাবেরই প্রাধান্য—বাহিরের সমারোহ তাহার প্রধান অঙ্গ নহে।''[২৯]

তিনি প্রবন্ধে আরো বলেছেন, পূর্বে যেখানে প্রীতিসূচক আত্মীয়তাই স্বাভাবিক ছিল; এখন সেখানে নিকট সম্বন্ধ স্থাপনেই অনেক সময়ে অত্যন্ত অশোভন ও অসঙ্গত বলে

মনে হয়। আগেকার দিনে উৎসবে ছিল অন্তরের টান।

বলেন্দ্রনাথও অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মত বুঝেছিলেন বাংলার লৌকিক জীবনের সঙ্গে দুর্মর সাযুজ্যে বাংলার নবজাগরণের উৎস। আর এই মনোবৃত্তিই বলেন্দ্রনাথকে আমাদের ব্রত পার্বণ ও অনুষ্ঠান সমূহের কল্যাণশ্রীতে মুগ্ধ করেছে। আমাদের পুরাতন জীবনযাত্রায় ও গার্হস্থ্য চর্চায় যে স্নিগ্ধতা ছিল তাকেই তিনি বারবার স্মরণ করেছেন। তিনি তাই প্রবন্ধে বলেছেন—

> ''দোল দুর্গোৎসবেই কি, বার ব্রত অনুষ্ঠানাদিই কি, আর জাত কর্ম্ম অন্নপ্রাশন বিবাহাদি সংস্কারগুলিই বা কি, অল্পদিন মধ্যে আমাদের সকল ক্রিয়াকর্ম্মেই যেন কি একটি পরিবর্ত্তন শুরু হইয়াছে—''[৩০]

তিনি আমাদের সমাজ স্বভাবের প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে ঐ প্রবন্ধেই বলেছেন—

> ''আমাদের দেশে, সমাজবন্ধনগুনেই হউক বা লোকের প্রকৃতিগুণেই হউক, উৎসবমাত্রেই চতুষ্পার্শ্বের সর্ব্বসাধারণের যেন একটি চিরন্তন অধিকার ছিল....।''[৩১]

এই সবের মাধ্যমে বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলার লৌকিক জীবনের সাযুজ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর সৌন্দর্য সাধক বলেন্দ্রনাথের লোকায়ত মনটির পরিচয় ও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে, কিন্তু কোথায় আমাদের এই আন্তরধর্মের শক্তি? কেমন এর স্বরূপ? এর উত্তরে প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথ বলেছেন—

> ''আমাদের উৎসবে ভাবেরই প্রাধান্য-বাহিরের সমারোহ তাহার প্রধান অঙ্গ নহে। পতিব্রতা স্ত্রীর সামান্য হাতের লোহা ও মাথার সিন্দুর যেমন আমাদের মনে একটি অনির্বচনীয় লক্ষ্মীশ্রী সূচিত করিয়া দেয়, নেত্রঝলসী অলঙ্কাররাজি তাহা পারে না। প্রীতি বিকশিত উৎসবের সামান্য মঙ্গল ঘট ও চূতপল্লবগুচ্ছ সেই রূপ আমাদের মনে একটি অনির্বচনীয় লক্ষ্মীশ্রী সূচিত করিয়া দেয়, নেত্রঝলসী অলঙ্কাররাজি তাহা পারেনা, প্রীতি বিকশিত উৎসবের সামান্য মঙ্গল ঘট ও চূতপল্লবগুচ্ছ সেই রূপ আমাদের অন্তরে

একটি শিবসুন্দর ভাব সঞ্চারিত করিয়া তুলে...”[৩২]

ফলে—

‘‘ আমাদের উৎসবে এই অন্তরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা। সমারোহ সহকারে আমোদ-প্রমোদ করায় আমাদের উৎসবকলা কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় না, কিন্তু তাহার মধ্যে সর্বজনের আন্তরিক প্রসন্নতা ও শুভ ইচ্ছাটুকু না থাকিলে নয়।..., যাত্রা হউক, কথা হউক, রামায়ণগান হউক বা চণ্ডীপাঠ হউক, যখন যাহা হয়, উন্মুক্ত গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া সর্ব্বসাধারণে তাহাতে অকাতরে যোগদান করে এবং সকলের সহিত একত্র হইয়া গৃহকর্ত্তা তাহা উপভোগ করেন।”[৩৩]

আমাদের উৎসবে শুভ কোথায় এবং কিভাবে তা শুভ হয়ে উঠতে পারে তাও তিনি দেখিয়েছেন—

‘‘কেবলি যে বড়বড় পূজাপার্ব্বণে এই বিধি তাহা নহে, ছোটখাট বারব্রত যে কোন অনুষ্ঠানেই এই শুভ ভাবটি রক্ষণীয়। এবং অনুষ্ঠানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। আজ পূজা, কালব্রত, পরশ্ব গঙ্গাস্নানের যোগ, অন্য দিন কোন শুভ তিথি বা বারমাহাত্ম্য... কোন মাসে পুত্রের বিবাহ, কোন দিন বা অরন্ধন...যেন একটির পর একটি শুভ অনুষ্ঠান ও আনন্দ-প্রবাহের অন্ত নাই। প্রচলিত প্রবচনে বারোমাসে তের পার্ব্বণ মাত্র স্থান পাইয়াছে, কিন্তু গণনায় বোধ করি প্রতিমাসে ত্রয়োদশ সংখ্যা ছাড়াইয়া যায়।”[৩৪]

বলেন্দ্রনাথের ‘শুভউৎসব’ প্রবন্ধে সর্বত্রই এক স্পর্শকাতর হিন্দুর জাতীয়তাবাদী মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। সুগভীর আন্তরিকতা ও রসিকতার অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে ‘শুভউৎসব’ প্রবন্ধটিতে। তাই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে হয়—

‘‘শুভ উৎসব,....প্রভৃতি বলেন্দ্রনাথের কতকগুলি গদ্য নিবন্ধ যতদিন বাংলাভাষা থাকিবে ও বাংলা সাহিত্য পঠিত হইবে ততদিন এক আদর্শ ও সুন্দর জগতের জন্য আমাদের মনে Sehnsucht অর্থাৎ আকুতি আনিবে, এবং আমাদের সেই অতীত সমাজাদর্শের

দ্বারা অনুপ্রাণিত গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনকে উদ্দেশ করিয়া জরমন মহাকবি গ্যেটের ভাষায় এক আগ্রহ, এক অব্যক্ত কামনা জাগরিত করিবে—

"এক পলকের জন্য দাঁড়াও
তুমি এত সুন্দর।"[৩৫]

তাই, সামাজিক মানুষের প্রিয়রচনা হিসাবে তথা প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ হিসাবে 'শুভ উৎসব' বলেন্দ্রনাথকে প্রাবন্ধিক হিসাবে উচ্চস্তরে যে নিয়ে গিয়েছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। ইতিহাসের তথ্যস্তূপ থেকে জাতির প্রাণস্পন্দনকে আবিষ্কার করার দুর্লভ অন্তঃস্পর্শী দৃষ্টি বলেন্দ্রনাথের ছিল বলেই তিনি বাংলার চারুশিল্প মুগ্ধতায় নূতন দিগন্ত উৎসারিত করে দিয়েছিলেন। এখানেই প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব।

তথ্যসূত্র

১। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'প্রাচীন উড়িষ্যা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৫২০

২। তদেব, পৃ. ৫২০

৩। তদেব, পৃ. ৫২৩

৪। তদেব, পৃ. ৫২২

৫। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'খণ্ডগিরি', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭; পৃ. ৫০৮

৬। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৪৯৯

৭। তদেব, পৃ. ৪৯৫

৮। তদেব, পৃ. ৪৯৬

৯। তদেব, পৃ. ৪৯৫

১০। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'বারাণসী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৫৩০

১১। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'কণারক', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৫১৮

১২। তদেব, পৃ. ৫২০

১৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, বিচিত্র প্রবন্ধ, 'মন্দির', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ৯৩

১৪। তদেব, পৃ. ৯৬

১৫। তদেব, পৃ. ৯৬

১৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র' ১, বিশ্বভারতী ১৪০০, পৃ. ২৩

১৭। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'ছিন্নপত্রাবলী', রচনাবলী (একাদশ খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬১, পৃ. ৯২

১৮। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'কণারক', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৫১৯

১৯। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, পথে-বিপথে, ‘গমনাগমন’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃ. ১১০
২০। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘বোম্বায়ের রাজপথ’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৫৩১
২১ ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘লাহোরের বর্ণনা’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৫৮৫
২২। ঠাকুর রথীন্দ্রনাথ, ‘পিতৃস্মৃতি’, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৩৮৭, পৃ. ২৮-২৯
২৩। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘হিন্দু দেবদেবীর চিত্র’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৪১৭, পৃ. ৬০
২৪। তদেব, পৃ. ৬০
২৫। তদেব, পৃ. ৬১-৬২
২৬। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘দিল্লীর চিত্রশালিকা’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৫৪২
২৭। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘দেয়ালের ছবি’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৪১৭
২৮। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘কণারক’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৫১৮
২৯। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘শুভ উৎসব’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৫৬৮
৩০। তদেব, পৃ. ৫৬৪
৩১। তদেব, পৃ. ৫৬৪
৩২। তদেব, পৃ. ৫৬৯
৩৩। তদেব, পৃ. ৫৬৮
৩৪। তদেব, পৃ. ৫৬৪
৩৫। জোয়ারদার দেবদাস (সম্পা.), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৪৪-৪৫

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যচর্চা : বলেন্দ্রনাথের বহুমুখী গতিমুখ

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যচর্চা: বলেন্দ্রনাথের বহুমুখী গতিমুখ

বলেন্দ্রনাথ যে শুধুমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যের জগতেই বিচরণ করেছেন তা নয়, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনাচিন্তা একালে অনেকেই মনে রাখেন না। বলেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা দ্বারাই বাংলা সমালোচনা সাহিত্য সমৃদ্ধ করেন নি, প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রসাস্বাদন ও তাদের যথাযথ মূল্য-নির্ধারণেও তাঁর সযত্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বলেন্দ্রনাথ যে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কবি ও কাব্য সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না তার প্রমাণ মেলে 'বিদ্যাপতি ও 'চণ্ডীদাস', 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য', 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী', 'কৃত্তিবাস ও কাশীদাস', 'রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর', 'ভারতচন্দ্ররায়', 'কেতকা-ক্ষেমানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধে। উক্ত প্রবন্ধগুলিতে প্রাচীন বাংলাকাব্য ও আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সাধারণ চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও রূপরীতির পরিচয়ও মেলে। সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনায় বলেন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি সমালোচনা শক্তিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও সূক্ষ্ম রসবোধের মাধুর্য আভাসিত হয়েছে প্রবন্ধগুলিতে।

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ হয়ত বলেন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথের কাছে এবং ঠাকুর বাড়ির আবহাওয়াতেই গড়ে উঠেছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ বলেন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রবন্ধ রচনা করেন 'ভারতী' পত্রিকায়। এর কয়েকবছর পরেই ১২৯৬ বঙ্গাব্দে বলেন্দ্রনাথের 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' রচনাটি একটি তুলনামূলক আলোচনা। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিকৃতির মধ্যে ভাব ও ভাষাগত যে পার্থক্য আছে তাকেই প্রাবন্ধিক প্রকাশ করেছেন মাত্র। তাই তিনি বলেছেন—

> ''শুধু ভাবের কথা কেন, বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের ভাষারও বিস্তর প্রভেদ; বিদ্যাপতি হিন্দীর ধারে ধারে ফিরিয়াছেন, তাঁহার অনেক কথা স্পষ্ট হিন্দী; চণ্ডীদাস বাঙ্গালী, তাঁহার লেখায় হিন্দী

বড় একটা জোর করিয়া উঠিতে পারে নাই, তবে প্রাচীন বাঙ্গলার হিন্দীর সহিত সম্পর্ক আছে যে, ইহা বুঝা যায়।"[১]

আবার 'প্রেম' সম্পর্কে দুই কবির ধারণা যে আলাদা তাও তিনি ব্যক্ত করেছেন এই প্রবন্ধে।

"বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসকে প্রেমের কবি বলা যাইতে পারে। প্রেমের সুরে চণ্ডীদাস যেমন গাহিতে পারিয়াছেন, বিদ্যাপতি তেমন পারেন নাই।...বিদ্যাপতিও প্রেমের উপরে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,কিন্তু চণ্ডীদাসের মত উচ্চভাবের কথা তাঁহার মন্তব্যে পাওয়া যায় না।"[২]

বলেন্দ্রনাথ 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণ রাধার সৌন্দর্য কিরূপে দেখেছেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

"বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণ রাধার বাহ্য সৌন্দর্য্য বৈ কিছুই দেখেন নাই। তিনি রাধার প্রত্যেক অঙ্গ স্বতন্ত্র ভাবে দেখিয়াছেন অধরের রাঙিমা, নয়নের চাহনি, চরণের গজেন্দ্র গমন। রাধা হাসিয়া কথা বলিতেছেন, সে হাসির সৌন্দর্য্য কিরূপ? না, শরৎ পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছে। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ রাধার সকল বাহ্য সৌন্দর্য এক করিয়া মোটামুটিভাবে প্রায় দেখেন নাই। কেবল দু'এক জায়গায় রাধাকে এক করিয়া দেখিয়াছেন মাত্র।..... চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ ও রাধার বাহ্য সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ। তিনিও রাধার বদনকমল, হরিণনয়ন দেখিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ বিদ্যাপতির কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধাকে দেখিয়াছেন ভাল করিয়া। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ, রাধার তাঁহার প্রতি লক্ষ্যই অধিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, সমস্ত রাধাকে দেখিবার—

তাঁহার সুবিধা হইয়া উঠে নাই, কিন্তু খানিকটা রাধাকে তিনি বেশ করিয়া দেখিয়াছেন। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ, রাধার আড়নয়নে ঈষৎ হাসি লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত রাধাকে— আপাদমস্তক—

তিনি দেখিতে ভুলেন নাই। রাধাকে ভাগে ভাগে অঙ্গে অঙ্গে ছাড়া এক করিয়াও তিনি অনেকটা দেখিয়াছেন।"[৩]

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পূর্বরাগ' পর্যায়ে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ কিভাবে রাধাকে দেখেছেন তারও বর্ণনা দিয়েছেন তুলনামূলক ভাবে। যেমন—

"....দুইজনের রাধাই হাবভাবশূন্যা নহেন। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা ফিকির কৌশলে দক্ষা অধিক। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ দেখিয়াছেন, রাধার হাসির চাহনি পর্য্যন্ত। কিন্তু বিদ্যাপতির কৃষ্ণ দেখিয়াছেন আরও ঢের। রাধা হাসিয়া তাঁহার পানে ফিরিয়া দেখেন, দূরে গিয়া সখীদিগকে ডাকিবার ছলে শ্রীকৃষ্ণের পানে চাহিয়া লয়েন, ইত্যাদি। শুধু ইহাই নহে, মুক্তাহার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সখীদিগকে মুক্তা কুড়াইতে বলেন, এই অবসরে তাঁহার শ্যামদর্শন হয়। এ রাধা চণ্ডীদাসের রাধা অপেক্ষা পাকা। চণ্ডীদাসের রাধার এতটা কৈ ত জানা যায় না।"[৪]

বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের নাম অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। দু'জনেই প্রাক্ চৈতন্যযুগের কবি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে দু'জনেই পদ রচনা করেছেন। কিন্তু উভয়ের কবিসত্তার পার্থক্য যথেষ্ট।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মধ্যে তুলনা করেছেন রবীন্দ্রনাথও। তিনি 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে বলেছেন—

"বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে

সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন। তাঁহার প্রেম 'কিছু কিছু সুধা বিষগুণা আধা', তাহার কাছে শ্যাম যে মুরলী বাজান তাহাও 'বিষামৃতে একত্র করিয়া'।"[৫]

বলেন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' প্রবন্ধের শেষেও দুই প্রাচীন কবির স্বভাবধর্মের বিসদৃশতার উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"বিদ্যাপতির কবিতা দেখিলে তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক, তাঁহার লেখায় সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়া দেখা যায়। তাঁহার উপরে জয়দেবের বিশেষ প্রভাব। চণ্ডীদাস ঠাকুরে কাহারও বড় প্রভাব দেখা যায় না।..... মানময়ী রাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্য দেখিলেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে। চণ্ডীদাসের ছন্দ প্রায়ই কিছু ছুটন্ত, বিদ্যাপতি কিছু ধীর। কিন্তু লেখা দেখিয়া চণ্ডীদাসকে যেমন সহজে চেনা যায়, বিদ্যাপতিকে তেমন সহজে ধরা যায় না। চণ্ডীদাস আপনার লেখায় ফুটিয়াছেন অধিক।"[৬]

'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ অতীত ও বর্তমান সাহিত্যের মধ্যে একটা বন্ধনসূত্র রচনা করেছেন। আমরা সবাই জানি অতীতের গর্ভ থেকেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ কেউই সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই বলেন্দ্রনাথ আলোচ্য প্রবন্ধের সূচনাতেই এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখিয়েছেন—

"প্রাচীন সাহিত্য পুরাতনকালের ভাবের ইতিহাস, সেইজন্য পুরাতনকে জানিতে হইলে পুরাতন সাহিত্যকে বিশেষ করিয়া জানিতে হয়। সে সময়ের সাহিত্য না জানিলে সে সময়ের লোকের অবস্থা সম্যক বুঝিয়া উঠা অসম্ভব, সেই পুরাতন ভাবের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে কিরূপে আমাদের এই পরিবর্তিত অবস্থা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। সাহিত্য আমাদের অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বন্ধনসূত্র— প্রাচীন সাহিত্য অতীতের ভাবের একমাত্র স্মৃতি। এই জন্য পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে

আমাদের গভীর আনন্দ আছে— পুরাতন সাহিত্যে কোথাও ভাবের মহত্ত্ব দেখিলে হৃদয় পুরিয়া উঠে, পুরাতন সাহিত্যে বর্ণনার সৌন্দর্য্য দেখিলে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, পুরাতনের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আমরা যেন ভাল করিয়া দাঁড়াইবার ভরসা পাই।"[৭]

এ ছাড়া বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে সর্বজনজ্ঞাত সাধারণ সত্যগুলো সহজ সরল ভঙ্গিতে সজ্জিত করলেও প্রবন্ধের প্রাক্ অন্তিম অনুচ্ছেদে বলেন্দ্রনাথ বলেছেন—

"জয়দেব বাঙ্গলা ভাষার আদি কবি না হৌন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাবের প্রথম কবি বটে।"[৮]

বলেন্দ্রনাথের এ বক্তব্যকে একবাক্যে আমরা মেনে নিই। কিন্তু আক্ষেপ এই যে, পরবর্তীকালে বলেন্দ্রনাথ 'জয়দেব' নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে কোন কথাই উল্লেখ করেননি। তাঁর এই ঘোষণা নিছক ঘোষণারূপেই থেকে গেছে। প্রবন্ধের শেষে তিনি 'বিশেষ বিশেষ কবির লেখা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা' করার অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন। এমনকি পরবর্তীকালে 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী', 'কেতকা-ক্ষেমানন্দ', 'ভারতচন্দ্র রায়' প্রভৃতি প্রবন্ধে পূর্বকথিত ইচ্ছাকে পূরণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কবি প্রতিভার বিশ্লেষণে লেখকের সাধও সাধ্যের যথার্থ মিলন ঘটেনি। ফলে রচনাগুলি গতানুগতিক আখ্যান বর্ণনায় পর্যবসিত হয়েছে। কাহিনীর বর্ণনাসূত্রকে মাথায় রেখেই লেখক 'প্রাচীনবঙ্গ সাহিত্য' প্রবন্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের উদাহরণ দিয়েছেন—

"দেবতাকে বানর করিয়া না গড়িলে মন প্রবোধ মানে না। শিবের প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ইদানীং লক্ষ্মীছাড়া গঞ্জিকাসেবকের অস্থি পঞ্জর হইয়া উঠিয়াছে— কৈলাসধাম হইয়াছে গঞ্জিকার প্রধান আড্ডা, রাজনীতি বিশারদ অদ্বিতীয় রণপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ ছলনাপটু বংশীধর রমনীমোহনে পরিণত হইয়াছেন; মহত্ত্ব গাম্ভীর্য্য সুবিধামত ছিব্‌লামিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।"[৯]

'ভারতচন্দ্র রায়' প্রবন্ধে, নিছক কাহিনীর বর্ণনাসূত্রেই ভারতচন্দ্রের লেখনীর পারিপাট্য পরিহাস রসিকতা অথবা গল্প সাজাবার বিপুল ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন। ঘরোয়া ভঙ্গীতে কাহিনীর বর্ণনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে গ্রামীণ রসিকতার আমেজ—

''শিবের রকম দেখিয়া স্ত্রীগণ সকলেই অবাক্। এমনতর বাঘছাল-পরা ক্ষেপাবর ত কেহ কখনও দেখে নাই। নারদ ইহাকে কোথায় পাইলেন? সুন্দরবন হইতে ধরিয়া আনেন নাই ত? এমন কথাও মুখে আনে— রাম বল। স্ত্রীজাতির রসনা নারদের বিপক্ষে ধীরে ধীরে অনেক প্রকার গুজব তুলিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তার কণ্ঠ সরস বাক্যাবলী সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতেও ত্রুটি করিল না। নারদের বহু পুণ্যফল, তাই গালিগালাজের উপর দিয়াই গিয়াছে। নহিলে সম্মার্জ্জনী যদি গাঝাড়া দিতেন, নারদের অবস্থা কিরূপ হইয়া দাঁড়াইত, নিশ্চিত বলা যায় না।''[১০]

আবার ভারতচন্দ্রের সঙ্গে মুকুন্দরামের তুলনা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

''ভারতচন্দ্রের যে মৌলিকতা নাই, এমন কথা আমরা বলি না, কিন্তু তাঁহার চরিত্রচিত্রণে, রন্ধনাদি-বর্ণনে সহজেই কবিকঙ্কণকে মনে পড়ে। কবিকঙ্কণের শ্রীমন্তোপাখ্যান যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, অন্নদামঙ্গলে অল্পবিস্তর অনুচিকীর্ষা উপলব্ধি করা যায় কি না। কবিকঙ্কণের মধ্যে ভারত অপেক্ষা গাম্ভীর্য্য আছে। মুকুন্দরাম উন্নত চরিত্র চিত্রণে ভারত অপেক্ষা সমধিক দক্ষ। কিন্তু ভারত রঙ্গরসের প্রভাবে বঙ্গসন্তানকে সহজেই আকর্ষণ করিয়াছেন।''[১১]

ভারতচন্দ্রের একাধিক ত্রুটি প্রবন্ধে সমালোচনা করেও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধের শেষে ভারতচন্দ্রকেই বঙ্গ সাহিত্যের একজন প্রধান লেখক বলেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন—

''ভারতচন্দ্রই প্রাচীনবঙ্গের শেষ কবি।.....তাঁহার দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু সেজন্য তাঁহার সকল গুণ আমরা বিস্মৃত না হই। কালের অবস্থা বুঝিয়া প্রাচীন কবিদিগের দোষ অনেকটা মার্জ্জনীয়। ভারতচন্দ্রে এ কালের মত সৌন্দর্য্যজ্ঞান নাই, অসাধারণ কবিত্বও হয় ত নাই, আমাদের রুচিবিরুদ্ধ— বর্ত্তমান সমাজে অপাঠ্য অনেক জিনিস আছে, কিন্তু তথাপি ভারত

বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রধান লেখক। বঙ্গসাহিত্য তাঁহাকে অনেকদিন বাঁচাইয়া রাখিবে।"[১২]

শাক্ত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ প্রতিফলিত হয়েছে 'বঙ্গসাহিত্য : রামপ্রসাদের গান' প্রবন্ধে, যেখানে শ্যামাসঙ্গীতের আদি কবির সর্বপ্রধান কৃতিত্বের আলোচনা করেছেন। এই ভক্ত কবি রামপ্রসাদই যে আধ্যাত্মিকতা বিরহিত অশ্লীল 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচয়িতা একথা স্বীকার করতে বলেন্দ্রনাথের কণ্ঠ রোধ হয়নি। বলেন্দ্রনাথের এই উদার মানসিকতা সানন্দে অভিনন্দিত হবার মতো তাৎপর্যপূর্ণ। তাই তিনি আলোচ্য প্রবন্ধে বলেছেন— "অথচ এই বিদ্যাসুন্দরই রামপ্রসাদের কবিরঞ্জন উপাধির মূল কারণ।"[১৩]

রামপ্রসাদের প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

> "রামপ্রসাদ কালীর উপাসক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কালী উপাসক বলিলে বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, তাহা তিনি ছিলেন না। তাঁহার কালীও স্বতন্ত্র, পূজা পদ্ধতিও বিভিন্ন। তাঁহার পূজায় লালে লাল ব্যাপার নাই।"[১৪]

আধুনিকযুগের প্রাক্ উষায় রচিত ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের কাব্যের মধ্য থেকে সে যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে লেখক আমাদের দৃষ্টিকে সচেতন করে তুলবার পরামর্শ দিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন— "রামপ্রসাদ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে সময়ে বিলাসিতাই ত সমাজের অস্থিমজ্জা।"[১৫]

এমন কি যাঁরা বিদ্যাসুন্দরের আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধান করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

> "কষ্টকল্পনা করিয়া বিদ্যাসুন্দরের মধ্য হইতে আমাদের আধ্যাত্মিকতা বাহির করিবার আবশ্যক নাই। আমরা বিদ্যাসুন্দর পাঠে বঙ্গদেশের সে সময়ের সমাজের অবস্থা বুঝিতে পারি, তাহাই যথেষ্ট।"[১৬]

বলেন্দ্রনাথের এই মানস প্রতিচ্ছবি আমরা বঙ্কিমচন্দ্রেও পেয়ে থাকি। 'বিদ্যাপতি

ও জয়দেব' প্রবন্ধে তিনি সমাজের অবস্থাভেদের কারণ যে একটি নির্দিষ্ট নিয়মের ফল এ সত্যকে উপস্থাপিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলেছেন—

> ''সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়।....সাহিত্যও দেশ ভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়।.....তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে সাহিত্য দেশের অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।''[১৭]

সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় বলেন্দ্রনাথ এই নিয়মনীতিটি একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় তিনি যুগ ও সমাজজীবনকে মনে রেখেই তাঁর মানস বৈশিষ্টকে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মতো স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলতে পেরেছেন—

> ''সমাজের সাধারণ অবস্থা বুঝিতে হইলে ভাবের হিমাদ্রিশেখর হইতে একটু নামিয়া আসিতে হয়, যে সাহিত্যে সমাজের বাহ্যচিত্র যথেষ্ট অঙ্কিত হইয়াছে, এইরূপ সাহিত্যের অনুশীলন আবশ্যক। কারণ, মুখভঙ্গী দেখিয়া তাহা হইলে সহজেই মর্মস্থলে প্রবেশ করিবার সুবিধা হইবে।''[১৮]

প্রাচীন বাংলাকাব্য আলোচনায় বলেন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি বা মৃদু-মধুর হাস্যরসিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাঙালী কবিগণের রচনার যে অংশে অসংগতি, অসংযম ও অশালীনতা প্রকাশ পেয়েছে বলেন্দ্রনাথ তীব্র কটাক্ষ সহকারে তার উল্লেখ করে নিরপেক্ষ সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন। মধ্যযুগের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' নামক প্রবন্ধে মৃদুহাস্য পরিহাস রসিকতা ও শ্লেষব্যঞ্জক মন্তব্য দ্বারা তাঁর আলোচনার সূত্রপাত করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর এই আলোচনা আনুপূর্বিক অর্থাৎ শেষাবধি তাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি— মুকুন্দরামের কবি প্রকৃতির স্বরূপ ও সমগ্র বাংলা কাব্য ধারায় তাঁর গভীর রসগ্রাহিতা ও সরস যুক্তিপ্রিয়তার পরিচয় প্রকাশিত

হয়েছে। মুকুন্দরাম যে উন্নত, মহান্ গম্ভীর কল্পনালোকের কবি নন— তিনি যে সাধারণ দৈনন্দিন সংসারের খুঁটিনাটি ত্রুটি বিচ্যুতিরও কবি, এই সত্য পরিচয়ই বলেন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তাই তিনি বলেছেন—

> "মুকুন্দরামে ভাবের হিল্লোল কোথাও বড় খেলিতে পায় নাই, কবিত্ব বিকশিয়া উঠিয়া সৌন্দর্য্যের রহস্যদ্বার খুলিয়া দেয় না। বস্তুর অতীত প্রদেশে তাঁহার তেমন আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায় না—চর্ম্ম চক্ষুতে যাহা যেরূপ দেখিয়াছেন, তিনি সেইরূপই বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন। উচ্চদরের কবি তিনি নহেন, কিন্তু সাজাইয়া গল্প করিবার তাঁহার ক্ষমতা আছে।"[১৯]

বলেন্দ্রনাথ আবার আমাদের দেশের সতী সাধ্বী চরিত্রের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রাধা চরিত্রে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অবশ্য রাধা চরিত্রের এই গুরুত্বকে কেবলমাত্র তিনি নন, যুগ যুগ ধরে আপামর জনসাধারণই স্বীকার করে নিয়েছেন। এর কারণ দেখাতে গিয়ে বলেন্দ্রনাথ সেই সমাজ ব্যবস্থার কথাই উল্লেখ করেছেন। প্রেমিকা রাধার আন্তর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সারসত্যটি নিহিত রয়েছে তৎকালীন সমাজ কাঠামোর ভিত্তিমূলে। কারণ—

> "....সে সময়ের সামাজিক অবস্থা হয় ত রাধার প্রভাব প্রতিষ্ঠার অনুকূল ছিল। বোধ করি, আমাদের সমাজে প্রেমচর্চ্চা তখন অনেকটা রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মানবহৃদয় কিছু আর সকল সময়ে সমাজ-নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলে না। রাধার আবির্ভাবে সে আপনার অন্তর তন্ত্রীতে আঘাত অনুভব করিল। দেখিল, তাহার হৃদয়ের সহজ আকাঙ্ক্ষা রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনীতে ব্যক্ত হইয়াছে।"[২০]

আবার বলেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে সুস্মিত হাস্যরসও পরিবেশন করেছেন—

> "তবে ভিন্ন রুচিও ত সংসারে আছে। আমাদের অন্তঃপুরচারিণীগণ কিরূপ সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী বলা যায় না। বাঙ্গালা দেশেই ত বীর সেনাপতি কার্ত্তিকেয় সৌখিন বাবু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।"[২১]

এই সামাজিক চেতনার অনিবার্য প্রকাশ ঘটেছে বলেন্দ্রনাথের 'বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা' প্রবন্ধে। এখানে বলেন্দ্র দৃষ্টি খানিকটা অভিনব। তিনি তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ করে, তখনকার স্বেচ্ছাচারী শাসকদের প্রতিনিধি করেই মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। তাই তিনি বলেছেন—

> ''যেমন রাজ্যশাসন, দেবশাসনও তেমনি। এই পার্থিব শাসনতন্ত্রেরই আদর্শে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য কেবল আপনার দেবতাগুলি দিয়া একটি নূতন শাসনতন্ত্র গঠন করিয়াছেন মাত্র। অপরিণত বুদ্ধি একটা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নবাবশাবকের পরিবর্ত্তে সেখানে একজন অব্যবস্থিত চিত্ত দুর্দ্ধর্ষ দেবতা বসিয়া রাজত্ব করেন;.....নবাব এবং বাদশাদেরই মত খামখেয়ালি মেজাজ— ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট— কখন্ এবং কেন যে কাহার প্রতি সদয় নির্দ্দয়, বুঝা ভার।''[২২]

এইরূপ খামখেয়ালি আচরণ বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবচরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ বলে তিনি মনে করেছেন। দেবচরিত্র আঁকতে গিয়ে বলেন্দ্রনাথ যেভাবে মঙ্গলকাব্যের কাহিনী বিশ্লেষণ করেছেন কিংবা চরিত্রের রসগ্রাহী আলোচনায় মনোনিবেশ করেছেন তা প্রবন্ধটিকে প্রথমাবধিই আস্বাদ্য করে তুলেছে।

'বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা' প্রবন্ধটি বলেন্দ্রীয় প্রবন্ধ সাহিত্যের মান বৃদ্ধি করার প্রধান কারণ বলেন্দ্রনাথের উদার দৃষ্টিভঙ্গী। রবীন্দ্রনাথ 'রাগদ্বেষ প্রসাদ-অপ্রসাদের লীলাচঞ্চলা যদৃচ্ছাচারিণী শক্তিই তখনকার কালের দেবত্বের চরমাদর্শ' বলে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের চরিত্রের যে মূল্যায়ণ করেছিলেন তা বলেন্দ্রনাথের প্রায় দশ বছর আগে গৃহীত সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি। বলেন্দ্রনাথ প্রবন্ধটিকে রসগ্রাহী করতে পেরেছেন তার মূলে আছে মঙ্গলকাব্যের কাহিনী বিশ্লেষণ, চরিত্রের রসগ্রাহী আলোচনা এবং এর মাঝে মাঝে চতুর ও চটুল মন্তব্য সংযুক্ত করে প্রবন্ধটিকে আগাগোড়া আস্বাদ্য করে তুলেছেন।

প্রবন্ধের শেষে অবশ্য প্রাবন্ধিক সেকালের সঙ্গে একালের সমাজব্যবস্থার একটা

আমূল পার্থক্য নির্দেশ করে নতুন এক আশা ও উদ্যম ব্যক্ত করেছেন— যেখানে আমরা সবাই এক হয়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছি। তাই তিনি এই প্রবন্ধে বলেছেন—

> ''এখন কাল ফিরিয়াছে। সে সহস্র খুচরা দোর্দণ্ডপ্রতাপ নবাব নাই। এক বৃহৎ নিয়মতন্ত্রের অধীনে সমস্ত ভারতবর্ষ একছত্র---- একরাজা, এক নিয়ম, সহস্র রাজপুরুষ একই সম্রাটের সহস্র বাহু। এবং এই বিপুল রাজশক্তি সমস্ত প্রজার সুনিয়ত স্বাধীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা এবং শান্তি।.....এক মহান্ ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মাধীনে আমরা এক হইয়া দাঁড়াইতেছি। আমদের নূতন আদর্শ, নূতন আশা, নূতন উদ্যম।''[২৩]

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল বৈষ্ণব সাহিত্য বা শাক্ত সাহিত্য কিংবা লৌকিক পুরাণের প্রতিই অনুরাগ পোষণ করেননি অনুরূপভাবে অনুবাদ সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ প্রতিফলিত হয়েছে 'কৃত্তিবাস ও কাশীদাস' নামক প্রবন্ধে। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে প্রথমেই যাঁর নাম মনে আসে তিনি হলেন কৃত্তিবাস ওঝা। বাল্মীকির রামায়ণকে তিনি বাংলাভাষায় পরিমার্জিত করে রচনা করলেন 'শ্রীরাম পাঁচালি'। আর প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে যতগুলি গ্রন্থ পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত বিস্তৃত পাঠকমণ্ডলী আর কোন গ্রন্থের ভাগ্যে জোটেনি। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে রামায়ণ মহাভারতকারদ্বয়ের প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য এবং সীমাবদ্ধতাকে পরিস্ফুট করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বাঙ্গালীর মানসপ্রকৃতি ও চরিত্র গঠনে মহাকাব্যদ্বয়ের প্রভাবও আলোচিত হয়েছে। বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের হৃদয়ের মণিকোঠায় রামায়ণ আজও এক অক্ষয়রূপে প্রজ্জ্বলিত। তাই বলেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলেছেন—

> ''বাঙ্গলাদেশে কৃত্তিবাসের রামায়ণের কথা যে জানে না, তাহার জাতি ঠাহরাইয়া উঠিতে পন্ডিতেরা পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। রামায়ণ না জানিলে বাঙ্গালীত্বের অসম্পূর্ণতা রহিয়া যায়।''[২৪]

কৃত্তিবাস যদিও নতুন বা প্রথম রামায়ণ রচনা করেননি তবুও কেন কৃত্তিবাসের রামায়ণের এত জনপ্রিয়তা? এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন্দ্রনাথ বলেছেন যে—

> ''তাঁহার গ্রন্থ বাল্মীকি গ্রন্থের অনুবাদ নহে— তাঁহাকে কতকটা

নিজের মস্তিষ্ক খাটাইতে হইয়াছে। শুনা যায়, কথকতা হইতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ সংগ্রহ। এইজন্য বঙ্গীয় কবি বাল্মীকি হইতে বিভিন্ন।"[২৫]

রবীন্দ্রনাথও বলেন্দ্রনাথের মতই একই মত পোষণ করেছেন 'প্রাচীনসাহিত্য'-এর 'রামায়ণ' প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন—

"রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতিভক্তি র সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে, যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।"[২৬]

বলেন্দ্রনাথ আলোচ্য প্রবন্ধে রামায়ণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কৃত্তিবাসের সময়, রচনার উৎকর্ষতার কথা বলেছেন। তাই তিনি বলেন—

"কৃত্তিবাস যে সময়ের লোক, তাঁহার রচনায় তাহার বিশেষ প্রভাব আছে। সময়ের প্রভাব হইতে তিনি একেবারে মুক্ত নহেন। বাল্মীকি গ্রন্থ প্রাচীন সংস্কৃত ভারতের সম্পত্তি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুদ্ধ বাঙ্গলাদেশের। তাঁহার গ্রন্থে বাঙ্গালীত্ব যথেষ্ট। ইহা না থাকিলে তাঁহার গ্রন্থের বিশেষ মূল্য থাকিত কি না সন্দেহ। তাঁহার নাম তাহা হইলে হয় ত অনুবাদকের ফর্দ্দের এক প্রান্তে সাহিত্যানুসন্ধিৎসু কতিপয় ছাত্রের গুরুভার মস্তিষ্কপীড়নীস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিত। গ্রন্থের এরূপ বহুল প্রচার হইত বোধ হয় না।"[২৭]

আর রবীন্দ্রনাথ 'রামায়ণ' গ্রন্থে বলেছেন—

"ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না, ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। গৃহ ও গৃহধর্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।"[২৮]

কৃত্তিবাসের পর বাংলা মহাকাব্যের মুখ রক্ষা করেছেন কাশীরাম দাস। বিদ্যাপতি

ও চণ্ডীদাসের মত সমসাময়িক কবি বা সমবিষয়ের কবি না হলেও বিষয় অনেকটা কাছাকাছি। আর দু'জনের গ্রন্থই বঙ্গীয় পাঠকসমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত। বলেন্দ্রনাথ রামায়ণ ও মহাভারতের মিল ও অমিল দু'য় আলোচ্য প্রবন্ধে বলেছেন। রামায়ণের চরিত্রগুলির সাথে মহাভারতের চরিত্রগুলির মিল তিনি খুঁজেছেন। অর্জ্জুনের সাথে লক্ষ্মণের চরিত্রের অনেকটা মিল খুঁজে পেয়েছেন। ভ্রাতৃপ্রেম, বীরত্ব, একইকারণে বনবাস উভয় বিষয়েই দু'জনেই সমধর্মী। একটি চরিত্র বলেন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল তিনি হলেন ভীষ্মদেব। তার উল্লেখ রামায়ণে নেই— মহাভারতের নিজস্ব সৃষ্টি। তাই তিনি বলেছেন—

> ''রামায়ণে আর যাহাই থাকুক, মহাভারতের একটি চরিত্রের অভাব আছে— ভীষ্মদেব। ভীষ্মকে মহাভারত বৈ আর কোথাও দেখা যায় না। ভীষ্ম মহাভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব।''[২৯]

আবার দুই মহাকাব্যের মধ্যে পার্থক্যও চোখে পড়েছে প্রাবন্ধিকের—

> ''মহাভারতের প্রধান প্রধান স্ত্রী চরিত্র অপেক্ষা রামায়ণের প্রধান স্ত্রীচরিত্রগুলি উচ্চদরের। কুন্তীই বল, আর দ্রৌপদীই বল, সীতার পার্শ্বে বসিবার মত কেহই নয়।''[৩০]

এই দুই মহাকবির দুই অমর সৃষ্টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথেরও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তিনি তাই বলেছেন—

> ''এমন অবস্থায় রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে, রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয়না। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।''[৩১]

রামায়ণ, মহাভারত থেকে মানবচরিত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু যে জানা যায় তা বলেন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন। তাই তিনি বলেছেন—

''রামায়ণ দেখাইয়াছে, রাজা দশরথ সসাগরা ধরিত্রীর সুশৃঙ্খল শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিয়াও অন্তঃপুরের সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, এইজন্য তাঁহার নিষ্কলঙ্ক বংশের কলঙ্ক রটিয়াছে, তাঁহার রাজ্যেও বিশৃঙ্খলা বাধিত, কেবল সুগভীর ভ্রাতৃপ্রেম তাহা ঘটিতে দেয় নাই। মহাভারত দেখাইয়াছে, ধৃতরাষ্ট্র বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান হইয়াও অতিরিক্ত মায়াবশতঃ পুত্রবর্গের কাল হইয়াছেন, পুত্রশাসন-অক্ষমতাই তাঁহার কুলনাশের প্রধান কারণ। ইহাতে আমরা দেখিতেছি যে, বহিঃশাসনক্ষমতা সকল সময়ে অন্তঃশাসন ক্ষমতার পরিচয় নহে। রাবণ ও দুর্য্যোধনের চরিত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, শাস্ত্রজ্ঞান ও ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান সংযম ও জ্ঞাতি-বঞ্চন- বিদ্যা-বিহীনতার প্রমাণ নহে। একই হৃদয় একই বিষয়ে বিপরীত ব্যবহার করে। এই জন্য মানবচরিত্র বুঝা বড় দায়।''[৩২]

বলেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন নি, বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধগুলিতেও নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। সাফল্যের মাপকাঠিতে হয়তো বা এগুলি কম প্রশংসা পেলেও এর মধ্য দিয়ে তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ উন্মোচিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ১৮০

২। তদেব, পৃ. ১৮১

৩। তদেব, পৃ. ১৮৩

৪। তদেব, পৃ. ১৮৩

৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি', বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৯৮, পৃ. ৯২

৬। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ১৮৮

৭। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ১৬৯

৮। তদেব, পৃ. ১৭৩

৯। তদেব, পৃ. ১৭০

১০। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'ভারতচন্দ্ররায়', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ২৭৪

১১। তদেব, পৃ. ২৭৪

১২। তদেব, পৃ. ২৮১

১৩। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'বঙ্গসাহিত্য: রাম প্রসাদের গান', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ২৪১

১৪। তদেব, পৃ. ২৪৪

১৫। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ২৬২

১৬। তদেব, পৃ. ২৬৬

১৭। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমরচনাবলী, 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', সুবোধ চক্রবর্তী (সম্পা.), কামিনী প্রকাশনালয়, কলিকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ১৯০

১৮। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৪১৭, পৃ. ১৯২
১৯। তদেব, পৃ. ১৯২
২০। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'রাধা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৪১৭, পৃ. ৩১৬
২১। তদেব, পৃ. ৩১৯
২২। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৪১৭, পৃ. ৪৬১-৪৬৩
২৩। তদেব, পৃ. ৪৭১
২৪। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'কৃত্তিবাস ও কাশীদাস', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ২২৬
২৫। তদেব, পৃ. ২২৬
২৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য, 'রামায়ণ', বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা, ১৩১৪, পৃ. ৯
২৭। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, 'কৃত্তিবাস ও কাশীদাস', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ২২৭
২৮। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য, 'রামায়ণ', বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা, ১৩১৪, পৃ. ৯
২৯। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'কৃত্তিবাস ও কাশীদাস', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ২৩১
৩০। তদেব, পৃ. ২৩০
৩১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য, 'রামায়ণ', বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা, ১৩১৪, পৃ. ৭
৩২। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'কৃত্তিবাস ও কাশীদাস', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১৭, পৃ. ২৩৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা রম্যরচনা : বলেন্দ্রনাথের স্থান

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা রম্যরচনা : বলেন্দ্রনাথের স্থান

প্রবন্ধের অন্যতম বিভাগ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা ভাবপ্রধান প্রবন্ধ (Personal Essay)। এর সঙ্গে যার সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশি সেটি হল রম্যরচনা। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মতোই এর থাকে একটি রমনীয়তা, খেয়ালির কল্পনার অবাধ বিস্তার এবং তথ্যভাবের পরিবর্তে রচনারস সম্ভোগের আস্বাদ্যমানতা। তবে পার্থক্য এই যে, রম্যরচনাকে যে ব্যক্তিগত হতেই হবে তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তা বস্তুগত কোন অবলম্বনকে উপলক্ষ করেও রচিত হতে পারে। সুললিত ভঙ্গীতে হাল্কা মেজাজে যে সব লেখা- তাকেই 'বেলেলেটার' বা 'রম্যরচনা' বলা হয়। লেখার বিষয়কে যে রমণীয় হতে হবে এমন নয়, যেকোনো বিষয়কেই রসিয়ে চারুত্বমাখা রমনীয়তা দান করতে হবে। লেখক নিজের মনের খেয়ালকে, লঘু চিন্তাকে ললিত ভাষায় হাল্কাভাবে বর্ণনা করেও পাঠকের মনোহরণ করতে পারেন, তরল কল্পনাবিলাসের সাহায্যে— তখনই তা রম্যরচনায় গণ্য হবে।

এখন আসা যাক রম্যরচনার উদ্ভব সম্পর্কে। 'রম্যরচনা' নামটি হাল আমলের হলেও 'বেলেলেতরস' কিন্তু অনেকদিনের। ফরাসি এই অভিধায় একধরনের 'লঘু-রচনা'কে বোঝাতো যা সুচারু, পরিমার্জিত, সুললিত গদ্যে রচিত হতো, স্বাদে ও স্বভাবে যা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের রচনা থেকে আলাদা। অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে জোনাথন সুইফ্‌ট্ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন The Talter সাময়িকপত্রের ৩০ সংখ্যায়। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় এই ধরনের হাল্কা প্রবন্ধধর্মী রচনা ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় Max Beerbohmএর প্রবন্ধাবলীর কথা।

যেকোনো রচনাকে সাহিত্য পদবাচ্য হতে হলে তো রম্য হতেই হয়। তবে কি সাধারণ অর্থে যাকে প্রবন্ধ বলা হয় তার থেকে স্বাতন্ত্র্য বোঝাতেই 'রম্যরচনা' নামকরণ? একথা ঠিক যে, 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ'এর সঙ্গে এই ধরনের লঘু রচনার প্রভেদ নির্দেশ করা সর্বদা সহজসাধ্য নয়। কোনো 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' বা হাল্কা 'familiar Essay' রম্যরচনার গোত্রভূক্ত হতেই পারে। যদিও 'রম্যরচনা' যে ব্যক্তিগত হবেই এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাগদ্যের দুটি সমান্তরাল ধারা লক্ষ করা যায়। একটি ভারী বা পণ্ডিতি সুর বিশিষ্ট অন্যটি সহজ বা ঘরোয়া। ঐ ভারী জাতের বিচার-বিশ্লেষণমূলক গদ্যরচনাকে বলা হয়েছে প্রবন্ধ আর হাল্কা সুরের রচনার ধারাটি ইদানিং কালে 'রম্যরচনা' অভিধা পেয়েছে। বিদ্যাসাগরের 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' ও 'আত্মচরিত', দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী', কোথাও কোথাও সঞ্জীবচন্দ্রেব 'পালামৌ' ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায় আদি রম্যরচনার হাল্কা ছাঁদটি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর'এও লঘুচাল ও রমণীয়তার ছাপ যেটুকু দেখা যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে সেই রমনীয়তা পূর্ণতর রূপ পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ'র রচনাগুলি, প্রমথ চৌধুরীর বীরবলী রচনায় একটা বড়ো অংশ বাংলা 'রম্যরচনা'র অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত।

রম্যরচনা হল পান্ডিত্য পূর্ণ বিচার বিশ্লেষণ থেকে দূরবর্তী এক লঘুচালের সৃষ্টিমূলক গদ্যরচনা। এতে কোথাও দেখি খানিক গল্পের আভাস, আবার কোথাও একটু কাব্যের মাধুর্য, আবার কোথাও হাস্য-পরিহাসের আলিঙ্গন। নানা খণ্ডের বাহারি সমবায়ে এ এমন এক সৃষ্টি যার কোনো ধরাবাঁধা বা নিশ্চিত লক্ষ্য বলে কিছু নেই। প্রগ্‌লভতা ও চাপল্যের খানিক বৈঠকি চালে তা দিব্যি জমে ওঠে। কথা বলার সহজ, সরস, মজলিশি ভঙ্গিতে রম্যরচনার অনবদ্য রূপকার মুজতবা আলি। ভাষা ও ভঙ্গির রম্যতায় অত্যন্ত সাধারণ বিষয়ও মুজতবার কলমে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। তাই রম্যরচনাকার হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে একজনের নাম না করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে— তিনি বীরবল বা প্রথম চৌধুরী। সম্পূর্ণ মজলিশী ভঙ্গিতে তিনি যেসব রম্যরচনা সৃষ্টি করেছেন সেগুলি বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে শাণিত এবং উপভোগ্য। রম্যরচনায় বৈশিষ্ট্য হিসাবে তাই বলা যায়—

ক) হাল্কা বৈঠকি চালে, ঘরোয়া মেজাজে, লঘু হাস্যরসাত্মক, রম্য কল্পনার স্পর্শযুক্ত যে কোনো গদ্য রচনাকেই 'রম্যরচনা' বলা যায়।

খ) রবীন্দ্রনাথের মতে রম্যরচনা হলো 'বাজে কথা'র রচনা— ''অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে। যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়।'' এই মন্তব্যের আলোকে দেখলে নির্ভার, স্বছন্দ, খেয়ালি

কল্পনায় সর্ববন্ধনমুক্ত রম্যতাই এ জাতীয় রচনার চরিত্র লক্ষণ।

(গ) ভার-বর্জনের প্রয়াস যেমন থাকবে ভাষা ও আঙ্গিকে, তেমনই থাকবে বিষয়েও। কোনো গভীর তত্ত্বকথা প্রকাশের তাগিদ বা পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের বাসনা যেমন থাকবেনা, ভাষাভঙ্গি তেমনই স্বছন্দ স্বাধীন গতিতে চলবে কোনো স্থির অনুশাসনের পরোয়া না করে।

(ঘ) লেখক ও পাঠকের নিবিড় সান্নিধ্য ও লঘু সরস আড্ডাই রম্যরচনার প্রাণ। মজলিশি মেজাজ না থাকলে এ রচনার উপভোগ্যতা হারিয়ে যায়।

(ঙ) দরকারি বিষয়ের গম্ভীর আলোচনা বা বিশ্লেষণের পরিবর্তে মজাদার আলাপচারিতাই রম্যরচনায় প্রত্যাশিত।

এখন ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও রম্যরচনাকে অভিন্ন বলে অনেকে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে ফরাসী লেখক মোঁতেনের মন্তব্যটি মনে আসে— 'Reader, myself am the matter of my work'. যেকোনো ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লঘু চপল কল্পনার রঙে রঞ্জিত হলে তাকে 'রম্যরচনা' বলা যেতে পারে ঠিকই, কিন্তু কেবলমাত্র রমণীয়তার গুণেই কোনো রচনা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে রম্যরচনার লক্ষণগুলি চর্চিত হবার সম্ভাবনা ও সুযোগ বেশি। বিষয়ও আঙ্গিকগত ভারশূন্যতার কারণে রম্যরচনা প্রবন্ধের চেয়ে বেশি উপভোগ্য, স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ ও গতিময়। রঙ্গরস, হাল্কা কৌতুকপরতা অর্থাৎ 'fun' বা 'humour' রম্যরচনার লক্ষণবিচারে একটি আবশ্যিক শর্ত। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে যা সবসময় পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না। আবার অনেক রম্যরচনাতে ছোটগল্পের উপকরণ থাকতে পারে তবে ছোটগল্প একটি সুসংহত, সুশৃঙ্খল আঙ্গিক যা আখ্যান ও শৈলীর সচেতন সমন্বয়ে সার্থক। রম্যরচনার তুলনায় বন্ধনযুক্ত আপন খেয়ালে সঞ্চারমান। তাই রম্যরচনার মধ্যে ছোটগল্পের গুণ থাকলেও তা এক গোত্র নয়। রম্যরচনা ছোটগল্পের তুলনায় অনেক লঘুভার; তাতে কোনো কাহিনিবৃত্ত নাও থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে কোনো সুনির্দিষ্ট ও সুপরিণত জীবনদর্শন। ছোটগল্পের কেন্দ্রে লেখকের আবেগ-মনন উপলব্ধির যে সর্বজনীন সত্যভূমি রচনাকে চিরস্থায়িত্ব দেয়, রম্যরচনার সরস মধুর খণ্ডতায় তার কোনো নিবিড় ইশারা থাকে না।

শুধুমাত্র রম্যতার গুণেই যেকোন প্রবন্ধ 'রম্যরচনা' হতে পারেনা। তার সঙ্গে দেখতে

হবে প্রবন্ধটির ভাষার সরস রমণীয়তা— যা রবীন্দ্রনাথের ছোটোদের জন্য লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা 'বিশ্বপরিচয়' মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ভাষার সাথে সাথে দেখতে হবে আড্ডা বা মজলিসের বৈঠকি চাল, স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দও শিথিলগতি, সেন্স অব হিউমার, পাঠকের সঙ্গে লেখকের খোলামেলা আলাপচারিতা ইত্যাদি বিষয়গুলিও। রম্যরচনার স্বরূপ নানাভাবে প্রকাশিত হতে পারে যেমন— নকশা, কড়চা, পত্র, জার্নাল আঙ্গিকে আর সেইজন্যই কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকস্া', বুদ্ধদেব বসুর 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' গ্রন্থের অন্তভূক্ত 'ক্লাইভ স্ট্রিটে চাঁদ' নিবন্ধ 'রম্যরচনা' রপে স্বীকৃত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিচিত্র প্রবন্ধ সংকলনভুক্ত 'বাজে কথা' নামে প্রবন্ধটিতে বলেছিলেন—

> ''অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে। যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়।''[১]

লেখক একজন মানুষ যার 'বাজে কথা'তেই থাকে তাঁর ব্যক্তিত্বের অকপট পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে আরো বলেছেন যে— 'বাজে কথা নিজের মত করিয়াই বলিতে হয়'।[২] সেই অর্থে লেখকের 'বাজে কথা', প্রমথ চৌধুরীর শব্দবন্ধে যা 'খেয়ালীকথা' তা কি কেবলই এলোমেলো কথার জাল বোনা? নাকি সেসব কথার গভীরে কোনো এক অন্তর্লীন জীবনসত্যই তাকে রম্যরচনা নিছক মজলিশি সরসতা থেকে একধরনের স্বাতন্ত্র্য দিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে গোপাল হালদার তাঁর 'আড্ডা' গ্রন্থের ভূমিকায় 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' ও 'বেলেলেতরস' নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে উভয়ের মধ্যে গোত্রগতভাবে সাদৃশ্য থাকলেও এক নয়। 'রম্যরচনা' চরিত্রগতভাবে 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' অপেক্ষা লঘু এবং তাকে 'রসনিবন্ধ' অভিধায় চিহ্নিত করা যায়। তাঁর মতে কথার খেয়ালিপনায় গড়ে ওঠা রম্যতা যতখানি 'রম্যরচনা'র মূল আকর্ষণ ততখানি 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' এর নয়।

জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, বিচিত্র ঘটনাসমূহ, যুক্তিপূর্ণ চিন্তা, করুণ রসে নিষিক্ত রোমান্স কিংবা একান্ত জীবনের কিছু কথা, কিছু ছবি যার মধ্যে গল্পরস প্রাধান্য পায় সেই 'রম্যরচনা' স্বাদে গন্ধে উপন্যাসের খুব কাছাকাছি চলে আসে। যদিও 'রম্যরচনা'

কখনোই উপন্যাসের সমধর্মী বলা যায়না অথচ হৃদয়বৃত্তির প্রাধান্যে তারা যেন সহমর্মী দুই সখীর মতো। উপন্যাসের মত কাহিনীর দৃঢ় গঠন 'রম্যরচনা'তে পাওয়া যায় না। উপন্যাসের মত নেই কোন সুনির্দিষ্ট সমাপ্তি। অনেকটা যেন জীবনের চলার পথে ইতস্ততঃ সঞ্চারমান দৃষ্টিতে ধরা পড়া জীবনালেখ্য। যে ভাষনের অসামান্যতায় দ্যোতিত হয় এই অমোঘ সত্য যে, জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। তাই 'রম্যরচনা'র অনেক লেখকই আত্ম ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন অর্থে স্বাতন্ত্র্য দীপ্ত 'অহং' এর প্রকাশ ভেবে থাকেন। কিন্তু আমরা জানি যে, আত্মঅহংকারের প্রাখর্য এবং চমকসৃষ্টির প্রলোভন দমন করতে না পারলে ব্যক্তিভাবের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। ফলে বাক্ চাতুরী বা অত্যাধিক লঘুরস চর্চায় এই সাহিত্য ধারা একান্তই লঘুতায় পর্যবসিত হয়। তাই এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—

> ''যাঁরা কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস কিছুই লিখতে পারেন না এবং সত্যিকার সাংবাদিক পর্যন্ত নন, যাঁদের না আছে তথ্যজ্ঞান, না উদ্ভাবনা শক্তি বা কলানৈপুণ্য। সংগতি রক্ষা করে কোনো বিষয়ে একদণ্ড চিন্তা করতে বা পরস্পর দুটো বাক্য রচনা করতে যাঁরা স্বভাবগুণে অক্ষম তাঁদের বিশৃঙ্খল প্রগল্‌ভতা ছাপার অক্ষরে উদ্ধৃত হয়ে উঠতে পারতো না, যদি না রম্যরচনা শব্দটির সৃষ্টি হতো।''[৩]

আর তাই এই শতাব্দীতে এসে দেখা যাচ্ছে যে রম্যরচনার লেখক এবং পাঠক উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সব রচনাই যে শিল্পের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ তা বলা না গেলেও তাদের নিজস্ব গুণাগুণকে সামনে রেখে নিঃসন্দেহে 'রম্যরচনা' বর্তমানে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অবস্থান করছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, প্রমথচৌধুরী, অন্নদাশংকর রায়, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখেরা এই রম্যরচনায় নিজেদের প্রতিভাকে প্রয়োগ করেছেন। আমার আলোচ্য বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই রম্যরচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত, এখন রম্যরচনাতে বলেন্দ্রনাথ কতটা সাফল্য লাভ করেছেন তা দেখবো।

রবীন্দ্র স্নেহধন্য বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যে ও জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অপরিসীম। অল্প বয়সে 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত গদ্য রচনা 'একরাত্রি' দিয়ে তাঁর

সাহিত্যজীবন শুরু। তারপর 'ভারতী' ও 'বালক' এবং পরবর্তীযুগে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সাধনা' পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লেখেন। এই পর্ব থেকে তাঁর প্রবন্ধের পরিণতির লক্ষণগুলি আরও স্পষ্ট হয়। বলেন্দ্রনাথের শেষপর্বের সব রচনাই 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময়কার রচনায় রবীন্দ্র প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। চিত্রধর্মিতা, আলঙ্কারিকতা ও গাঢ়বন্ধ পদ বিন্যাস, বলেন্দ্রের প্রবন্ধের সাধারণ লক্ষণ।

'বালক'-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় 'একরাত্রি' রম্যরচনায় আত্মপ্রকাশকালে বলেন্দ্রনাথের বয়স ছিল পনেরো বছর (১৫)। এক মেঘাবৃত বসন্তের রাত্রে এক মাঠে অতিপ্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষকে ঘিরে চিত্রময় বর্ণনা পাই এই রচনায়। 'বালক'-এর চতুর্থ সংখ্যায় বের হয় 'চন্দ্রপুরের হাট'। এটিও বর্ণনামূলক রম্যরচনা। এই প্রবন্ধে হাটের বিস্তৃতি ও বিচিত্র দৃশ্যাদির মধ্যেও তোলা আদায়ের বিশেষ দৃশ্য-চিত্রটি প্রাধান্য লাভ করেছে। ফলে পল্লীর হাটের সমগ্র দৃশ্যটি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। ষষ্ঠ-সপ্তম যুগ্ম সংখ্যায় তিনি 'বনপ্রান্ত' নামে আরও একটি রম্যরচনা লেখেন। একাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় চতুর্থ রম্যরচনা 'পুলের ধারে' ও 'সন্ধ্যা' নামে কবিতাটি। 'বালক'-এ প্রকাশিত তাঁর গদ্যরচনাগুলিতে সমাসবদ্ধ শব্দের ঝোঁক, শব্দে ধ্বনির ঝংকার, শব্দালঙ্কারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। পনেরো বছরের বালক বলেন্দ্রনাথ 'পুলের ধারে' রচনায় লিখেছিলেন—

''জ্যোৎস্নারাত্রে গঙ্গার ধারে দাঁড়াইলে শ্মশানের মাধুরী কেন মনে উদয় হয়? আমি এই পুলের ধারে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নায় শ্মশানের চিতাধূম দেখিতেছি। তুমি হয় ত কঙ্কাল মড়ার মাথা দেখিয়া বলিবে যে, ইহাতে আবার মাধুর্য্য কোথায়? কিন্তু শ্মশানদৃশ্যে যে মাধুর্য্য আছে, লোকলয় দৃশ্যেও সেরূপ মাধুর্য আছে কিনা সন্দেহ। মনে কর দেখি যে, যখন গভীর নিশীথে চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ ভাবের মধ্যে নিশীথিনীর ঘোর অন্ধকারের আবরণভেদ করিয়া 'হরিবোল' শব্দের সহিত একটা চিতা শবসমেত পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইতেছে আর চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র কঙ্কাল এক ভয়ানক গভীর স্বরে বলিতেছে—

> ''আয়''! সমস্ত শ্মশানভূমি তাহার সুদীর্ঘ শুষ্ক বিশালবক্ষ প্রসারিত করিয়া মেদিনীর গভীর অভ্যন্তর হইতে ডাকিতেছে ''আয় আয়''- তখন তুমি একলা যদি সেই শ্মশানে বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার মনে একটি গম্ভীর ভাবের অস্পষ্ট ছায়া পড়ে কি না!

সেই যে অস্পষ্টভাবের ছায়া পড়ে, তাহাতেই তুমি মাধুর্য্য দেখিতে পাইবে— বালক বালিকার পুতুলখেলা দেখিতে পাইবে। কি মজার খেলা! এই আজ আসিলাম, কাল হাসিলাম, একবার কাঁদিলাম আর এক বৃহৎ সমুদ্রে গা ভাসাইয়া দিলাম। দিয়া কোথায় চলিলাম? কে জানে!"[৪]

'পুলেরধারে' রচনায় রাতভর গঙ্গার পোন্টুন ব্রিজের ধার হয়ে নিমতলা পোস্তা রতন সরকারের গলি ধরে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ফেরার বৃত্তান্তটি দার্শনিকের দৃষ্টিতে লেখা। চিৎপুরের মুখে একটা বেরুশ গাড়ি রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ির আড়াল ছাড়াতেই—

"বাড়ীর সমস্ত মুক্ত দ্বারগুলি হইতে যেন শত স্রোতে প্রেমের সম্ভাষণ আসিয়া আমাকে টানিয়া লইল। সে প্রেমের মাধুরী কি বলিব!..... সমস্ত জগৎ যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার ছাতে দেয়ালে আশে পাশে অদৃশ্য হইয়া মিশিয়া গেল, বাড়ীর বাহিরে আর কিছু বাকী রহিল না।"[৫]

'ভারতী'তে লেখা সর্বত্রই তাঁর প্রবন্ধ শুধুমাত্র তথ্য পরিবেশনের মধ্যে সীমায়িত থাকেনি। বরং তথ্যকে ছাপিয়ে অনুভূতির গাঢ়বদ্ধতা সেখানে অনুভূত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

"...ইহার যদি কোনও মূল্য থাকে, তাহা বিষয়বস্তুর গৌরবে নয় রচনারস সম্ভোগে।"[৬]

ব্যক্তিগত রচনার সচেতন প্রয়াস রবীন্দ্র সাহিত্যে দেখা গেলেও বলেন্দ্রের দৃষ্টিতে এই ধারার সার্থক অনুসৃতি লক্ষ করা যায়।

বলেন্দ্রনাথ 'বসন্তের কবিতা', 'আষাঢ়ে গল্প' ও 'আষাঢ় শ্রাবণ' এই প্রবন্ধ তিনটিতে যেখানে ঋতু বর্ণনাই প্রবন্ধের বিষয় হতে পারত সেখানে প্রাবন্ধিক বস্তুনিষ্ঠতার পথকে পরিহার করেছেন। চিত্ররীতি ও সঙ্গীত রীতির সার্থক মেলবন্ধনে প্রকৃতির ভাবরূপই সেখানে উজ্জ্বল হয়েছে। এই ভাবরূপ প্রকাশনার মধ্যে রবীন্দ্র প্রভাব আমাদের দৃষ্টি

এড়িয়ে যায় না। দীর্ঘ গ্রীষ্মের অসহ্য দাবদাহের পর যখন আমাদের তৃষিত চাতক দৃষ্টির সম্মুখে অবলোকিত হয় এক খণ্ড কৃষ্ণ মেঘ, তখন স্বভাবতই পুরাতন দিনের স্মৃতির মত সেই মেঘ আমাদের মনে এক নতুনভাবের জন্ম দেয়। সেই সময় তার সবচাইতে যা ভাললাগার বিষয় তা হল 'আষাঢ়ে গল্প'। তাই বলেন্দ্রনাথ বলেন—

> ''আষাঢ়ে গল্প আমাদের স্মৃতির তীর্থক্ষেত্র, সহস্র স্মৃতি তাহার সহিত সুখে দুঃখে জড়িত। বাহির হইতে উঠাইয়া আনিয়া আমরা মনকে গৃহের অন্ধকারে যে বদ্ধ করিতে পারি, সে কেবল আষাঢ়ে গল্পের আকর্ষণে।''[৭]

আষাঢ়ে গল্প অসম্ভবের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। যেখানে সম্ভব ও অসম্ভবের সীমানা একাকার হয়ে গিয়েছে। তাই যেকোন ঘটনাই সেখানে ঘটতে পারে। যে ঘটনা বাস্তবের চিন্তাক্লিষ্ট মানবকে তার মানবিক শান্তি প্রদান করে। এখানে তাই ষোড়শী রূপসীকে মড়া বরের সঙ্গে মালা বদল করতে দেখে অথবা জীবন্ত সাতটা ভায়ের পরমুহূর্তেই সাতটি চাঁপার রূপান্তরণে কেউ বিস্মিত হয় না, তা উপন্যাসের বাস্তবতাবোধকে ক্ষুণ্ণ করলেও। তাই তাঁকে বলতে শুনি—

> ''অন্তিমে মৃত্যুর চিত্র থাকিলেও আষাঢ়ে গল্পে ট্রাজিডি হইতে পারে না।''[৮]

সেজন্যই দুই ঋতুর তুলনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ''আষাঢ়ের সহিত শীতের গল্পের প্রভেদ এই যে, আষাঢ়ে গল্প বৃদ্ধার গল্প-শীতের গল্প বৃদ্ধের গল্প।''[৯]

খুব সহজ চালে, লঘু গল্প বলার ভঙ্গিতে আষাঢ়ে গল্পের স্বভাবধর্ম্ম এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। সেইসঙ্গে মধ্যবিত্ত বাঙালীর মানসিকতাও ফুটে উঠেছে। বলেন্দ্রের প্রাবন্ধিক পরিচয় ছাপিয়ে এক কবির আগমন ঘটেছে এখানে। মানব ও প্রকৃতি যে অচ্ছেদ্য অদৃশ্য সম্পর্কে পরস্পর জড়িত, সে কথাই বলা হয়েছে। উভয় মাসের ভাবগত পার্থক্য সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথের অভিমত হল—

> ''আষাঢ়ে দুঃখ গভীর বটে, কিন্তু কেমন যেন একটু আশা আছে। শ্রাবণে কেবলই অন্ধকার ঘনাইতেছে— কোথায় আশা! কোথায় ভরসা! আষাঢ়ে মেঘের দিকে চাহিয়া তাহার কথা মনে করিতে

পারা যায়— মনে হয়, এমনতর মেঘের মত সেও যদি আসে!
শ্রাবণে সব একেবারে স্তম্ভিত।"[১০]

আবার এটাও ঠিক যে রসিক ভাব আষাঢ়ে শ্রাবণের চেয়ে বেশি। শ্রাবণ বিশেষ রসিক নয় সেখানে—

"অনেক রসিকতা এমনি দীনহীন বেশে ম্লানমুখে বাহির হয় যে,
তাহাদিগকে দেখিলে মায়া করে।"[১১]

আষাঢ় তার গল্পের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত। শ্রাবণের গল্প বলার ক্ষমতা কম। যদিও কাব্য রচনার শক্তি অধিক। আষাঢ়ে গল্পে চোখের জলের অবকাশ কম, শ্রাবণে অশ্রুজলে হৃদয় ঝরে পড়ে। এককথায় আষাঢ়ের ভাব হাল্কা। শ্রাবণের ভাবে আছে গাম্ভীর্য।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের তুলনাক্রমে বসন্তের প্রাসঙ্গিকতা এনেছেন বলেন্দ্রনাথ। এতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিময় কবি প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্ধব দাসের দুটি পদের তুলনা দিয়ে বসন্ত ও বর্ষার মত আষাঢ় ও শ্রাবণের প্রভেদকে পরিষ্কার করেছেন। যেখানে কবি বসন্তে বলেছেন—

"সো বরনারী তোহারি লাগি ঝুরত
রোয়ত সহচরী সঙ্গে।"[১২]

আবার বর্ষায় গেয়ে উঠেছেন—

"বর্ষা ঋতু ভেল , ঝরয়ে নয়নে জল,
দুখ সায়রে ধনী ভাসে।।"[১৩]

বলেন্দ্রনাথ বলেছেন যে, বসন্তে ক্রন্দন আছে, কিন্তু সে ক্রন্দন বিরহীর একেলার নয়, সঙ্গে সহচরী রয়েছে। অথচ বর্ষার গুরুতর বিরহে ক্রন্দনের সখী কেউ নেই। তাই—

"বসন্ত ও বর্ষায় যেমন, আষাঢ়ে শ্রাবণেও কতকটা সেইরূপ।
আষাঢ়ে দুঃখ গভীর বটে কিন্তু কেমন যেন একটু আশা আছে।
শ্রাবণে কেবলই অন্ধকার ঘনাইতেছে— কোথায় আশা! কোথায়
ভরসা। আষাঢ়ে মেঘের দিকে চাহিয়া তাহার কথা মনে করিতে
পারা যায়— মনে হয়, এমনিতর মেঘের মত সেও যদি আসে।
শ্রাবণে সব একেবারে স্তম্ভিত।"[১৪]

ঘনায়মান শ্রাবণ অন্ধকারে নির্জনে, নীরবে আপনার বিভীষিকার মধ্যে বসে থাকতে ইচ্ছা করে। তাই তিনি বলেন—

> ''মোটের উপর, বর্ষায় সহচরী সঙ্গ বড় ভাল লাগে না— একেলা থাকিতেই ইচ্ছা করে। সহচরীদের সান্ত্বনাবাক্য এ সময়ে হৃদয়ে শেলের মত বিঁধিতে থাকে। সুখের সময় সান্ত্বনা সহিতে পারা যায়— দুঃখের সময় যায় না।''[১৫]

তাই,

> ''বসন্তে সহচরীসঙ্গ ভাল লাগে— বর্ষায় বিজনে বসিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে।''[১৬]

আবার তিনি দুই ঋতুর তুলনা দিতে গিয়ে দার্শনিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন—

> ''বসন্ত ও বর্ষার কবিতা তুলনা করিয়া আমরা আরও বলিতে পারি— বসন্ত অদ্বৈতবাদী, বর্ষা দ্বৈতবাদী।''[১৭]

ঋতু বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'শ্রাবণের বারিধারা' রচনাটি সর্বোৎকৃষ্ট। এখানে কবির কল্পনাশক্তি যেন শ্রাবণের বারিধারার মতো অঝোর ধারায় বয়ে চলেছে অবিরত। বর্ষণমুখর শ্রাবণ দিনে প্রকৃতিতে যে আলো-আঁধারির খেলা চলে, সেই আলো অন্ধকারের সঙ্গে লেখক হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তাই নির্দ্বিধায় বলতে পারেন—

> ''...এই অন্ধকারময় ভাবপ্রবাহের মধ্যে মানবের হৃদয়ও অন্ধকার না হইয়া কি থাকিতে পারে?
>
> বর্ষায় আমাদের হৃদয় অন্ধকার হইয়া আসেই ত। অন্ধকার না হইলে শ্রাবণের বারিধারা কখনও কি উপভোগ করা যায়?...শ্রাবণের বর্ষণ আরম্ভ হইলে ভেকের মকমক ধ্বনি চাই, পৃথিবী তমসাচ্ছন্না চাই, চাই অনেক জিনিস— কিন্তু আলোক চাহি না।''[১৮]

দীর্ঘ বর্ষণে অবগাহন করে কবিমন তাই উদ্বেলিত হয়। উতলা মন আবেগ মাখানো কণ্ঠে বলেন—

> ''ঝর— শ্রাবণ ঝর।...তুমি শুধু ঝরিয়া যাও— তোমার ঝরঝরে

বর্ষে বর্ষে এমনি নূতন নূতন কাব্য রচিত হৌক। আমরা সেই কাব্যের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া একটু আনন্দ উপভোগ করি।"[১৯]

মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বাণী— "তোমার রূপে মরুক ডুবে, আমার দুটি আঁখির তারা'

এইসব প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন নিমেষেই যেন সরে যায় বিষয় থেকে বিষয়ীর দিকে, তন্ময়তা থেকে মন্ময়তার পথে। এটাই তো স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। এগুলিকে বলা যায় বিরল মুহূর্তে জনৈক ব্যক্তির অন্তরানুভূতির একান্ত ভাষ্য মাত্র।

এইরকম আর একটি প্রবন্ধ হল 'জানালার ধারে'। এই রচনায় আছে ঘরোয়া অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে পরিবেশনা। তাঁর ছোট্ট ঘরখানি, সেই ঘরের সজ্জা, বাইরের ক্ষুদ্র বাগানটি, বাগানের পুষ্প ভারাক্রান্ত ডালিম গাছটি, এমন কি পাঁচিলের পরপারে দাঁড়িয়ে থাকা জীর্ণ অট্টালিকার নিভৃত কক্ষের অর্দ্ধ স্তিমিত দীপালোকে দৃশ্যমান শূন্য বাতায়ন পার্শ্ব সবই পরিবেশনের গুণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই জানালার ধারে, নির্জন এক মানব অনুভব করছেন রজত প্লাবিত অনন্ত নীলাকাশ, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল পরিব্যাপ্ত অনন্ত এক জ্যোৎস্নালোক। তাই শোনা যায়—

> "সীমাহীন ছায়াহীন বাহিরের অগাধ রূপরাশি আমাকে বাহিরে টানে, গৃহ হইতে জগতে লইয়া যাইতে চায়, আমার গৃহকোণে এই নিভৃত মলিন ছায়া ম্লান নীরব কাতরতায় আমকে বাঁধিয়া রাখে। আমি সংসারের সুখের মাঝে বাহির হই না। এই চিরম্লান পরিত্যক্ত ছায়ার পার্শ্বে এমনি বসিয়া থাকি, মানব হৃদয়ের ছায়াময়ী বেদনা অনুভব করি।"[২০]

মানব জীবন তার অন্যান্য আবশ্যকতার মত শূন্যতারও একটা বিশেষ প্রয়োজন যে আছে তার প্রমাণ 'ক্ষণিক শূন্যতা' প্রবন্ধে আভাসিত। চর্তুদিকের অসীম বিস্মৃতির মধ্যে যা মানব জীবনের ক্ষণভঙ্গুর পরিতৃপ্তির অসহায়তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জীবনের সহস্র ঘটনার মিলন বিরহে আচ্ছন্ন থেকে কিছুক্ষণ যেন কালের অকূল পাথারে দিক হারিয়ে ফেলি। তারপর সব ঘটনা থিতিয়ে এলে আমাদের শূন্য ভাবও ঘুচে যায়। আবার

অনেকসময় আমাদের অন্যমনস্কতার জন্যও মানসিক শূন্যতাও ঘটে। সেই শূন্যতা প্রশমিত হলে যখন বর্তমান অবস্থায় ফিরে আসি, তখন—

> ''...আমরা অতীতের পানে চাহিয়াই সুখ লাভ করি। কারণ বোধ হয়, সেখানে জীবনের সহস্র বিপ্লবের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাই।''[২১]

ক্ষণিক শূন্যতায় যেগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে যায় বলেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন যে শূন্যতার মধ্যেই আমরা জীবনের বিবিধ বৈচিত্র্যকে অনুভব করতে পারি। শূন্যতাই এক একটি ছেদের রূপ ধারণ করে জীবনের সম্যক রূপটি আমাদের জানিয়ে দেয়। বৈঠকী আলাপের অন্তরঙ্গ সুরে পাঠককে তার জীবনের একটি বৃহৎ সত্যের সম্মুখীন করেছেন। এছাড়াও বলেন্দ্রনাথের আত্মমগ্ন ভাবচিন্তার স্বাক্ষর আছে 'অতীত', 'সে', 'দেয়ালের ছবি', 'দুজনায়', 'বোলতা ও মধ্যাহ্ন', 'অশ্রুজল' প্রভৃতি রম্যরচনাগুলিতে। এ প্রসঙ্গে আর একটি রম্যরচনার নাম মনে আসে তা হল 'পুরাতন চিঠি' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক স্মৃতিচারণার ফিরে গেছেন স্বর্ণমণ্ডিত অতীতের মোহময় ঘটনাপুঞ্জের মাঝে। বর্তমানের সঙ্গে সেই প্রিয় অতীতের যোগাযোগ ঘটিয়েছে 'পুরাতন চিঠি'। ছোট ডেক্সটি সকলের অজান্তেই সংগ্রহ করে রেখেছিল মানুষের হারানো অতীত। অথচ বন্ধ কোটরের মধ্যে সযত্ন পরিচর্যাতেও তা সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় না। তাই—

> ''অদৃষ্ট কীট নিঃশব্দে তাহাকে কাটিতে থাকে''[২২]

শীতের শুকনো হাওয়ায় উড়ে যাওয়া বহু স্মৃতি খচিত সেই অতীত বসন্ত হাওয়ার মত ক্ষণেকের জন্য হলেও ফিরিয়ে আনে এই পুরাতন চিঠি। কত হাসি, কত অশ্রু যা একদা প্রচণ্ড রকম সত্য ছিল, কালের জোয়ারে আজ সে সময় বদলে গেছে, বন্ধুও হয়ত। কিন্তু

> ''এই পুরাতন চিঠিগুলি আমার সেই প্রথম বয়সের বিজন স্মৃতিমন্দির।''[২৩]

বলেন্দ্রনাথ নিজেই জানাচ্ছেন যে জানি সে কথা অপরের ভাল লাগিবে না। হয়ত কেউ ত্রুটিও ধরবে, নয়ত সমালোচনা করবে। তবুও লেখক দৃঢ়স্বরে জানাছেন পুরাতন চিঠি তবুও তাঁর আপনার জন। ব্যাথার ব্যথী। এখানকার জগৎ তাঁর নিজস্ব জগৎ। তাই লেখক চুপিচুপি ফিরে গিয়েছেন তাঁর শৈবালাচ্ছন্ন অতীতের সমাধি মন্দিরে। যেখানে একটি

পেন্সিলের দাগে, পুরাতন পরিচিত অক্ষরে মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর নিজস্ব অতীত। তাই তিনি বলেন—

> ''ছোট্ট ডেস্কের মধ্যে আমার ছোটখাট জীবনের ছোটখাট অতীত চাবিবন্ধ। আমার পুরাতন জীবন ইহারই নিভৃত খোপে নিরিবিলি বাস করে।...আমি বর্ত্তমানশ্রান্ত পথিক, মধ্যে মধ্যে এই পুরাতনের স্নেহে শান্তিলাভ করিতে আসি। চুপিচুপি আমার শৈবালাচ্ছন্ন অতীতের সমাধিমন্দিরে গিয়া একা একা বসিয়া থাকি। একটি পেন্সিলের দাগে, দুইটি পুরাতন পরিচিত হাতের অক্ষরে আমার সমস্ত পুরাতন— আমার সমস্ত অতীত।''[২৪]

বলেন্দ্রনাথের 'পুরাতন চিঠি'র রস তাই ব্যক্তিগত রস। বলেন্দ্রের এই আত্মভাব প্রধান নিবন্ধ, বর্ণনা কৌশলের স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে নাটকীয় দক্ষতাযুক্ত হয়ে অনন্য সাধারণের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। আবার 'অশ্রুজল' প্রবন্ধেও রম্যরচনা গুণ ফুটে উঠেছে। তিনি লেখেন—

> ''হে অশ্রুজল! নিশ্বাস-শপ্ত হৃদয়ে তুমি চিরদিন শান্তি বর্ষণ কর, সেখান হইতে নির্ম্মম হাহাকার ঘুচিয়া যাক্। সংসারের শোক তাপ ভয়ে জরজর প্রাণে তুমি সেই অভয় পদের প্রতিষ্ঠা কর, ধরণীর পাপভার লঘু হৌক। তুমি এস, এই ক্ষুদ্র মানবশিশুর মলিন হৃদয়ে একবার এস, এ মরুভূমি ঘুচিয়া যাইবে। একবার শুধু এস, তুমি এস।''[২৫]

গীতিকবিতার মতোই বলেন্দ্রনাথ যেন তিনি পাঠকদের আহ্বান করেছেন তাঁর আত্মগত ভাবনা কামনা আর আনন্দ বিষাদের একান্ত জগতে। বলেন্দ্রনাথের 'অশ্রুজল' ও 'পুরাতনচিঠি' প্রবন্ধগুলি অনেক সময় হয়ে উঠেছে 'Poem in-Prose'।

বলেন্দ্রনাথের আত্মভাবনিষ্ঠ বিচিত্র প্রবন্ধগুলিতে তাঁর ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও গীতিময় কবিপ্রাণতার সুষমা সর্বাধিক প্রতিভাসিত হয়েছে। তবে এটিও দেখা যায় যে, বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবন্ধ গীতিধর্মী হইলেও তা গীতিকাব্যের অসংযত উচ্ছ্বাস বা

নিছক হৃদয়াবেগের অনন্তবিস্তারী মূর্ছনায় শিথিল হয়ে পড়ে না বরং কবিচিত্তের ভাবাবেগের মধ্যে এক সুদৃঢ় সংহতি বলেন্দ্রনাথের রম্যরচনাগুলিকে এক আলাদামাত্রা দিয়েছে। যথার্থ শিল্পী প্রাণের স্পর্শোত্তাপে ও পরিবেশনের শিল্পসুন্দর কলাকৌশলে নীরস, প্রাণহীন বিষয়ও যে হৃদয়গ্রাহী, রসোজ্জ্বল ও রমণীয় হতে পারে তা বলেন্দ্রনাথের রম্যরচনাগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায়। তাই এ প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেন—

> ‘‘বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে কোথায় কি দেখিবার, বুঝিবার, আস্বাদনের ও উপভোগের আছে তাহা তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছে ও দেখাইতে হইয়াছে। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিশ্লেষণও করিয়াছেন ও বাহিরে দাঁড়াইয়া সমস্তটা দেখিয়াছেন। ফুলের ভিতর হইতে মধু আহরণ করিতে গিয়া বাহির হইতে ফুলের শোভাটা দেখিয়া লইতে ভুলেন নাই।’’[২৬]

রামেন্দ্রসুন্দরের মন্তব্যটি কতটা যুক্তিযুক্ত তা বলেন্দ্রনাথের আলোচ্য প্রবন্ধগুলিই প্রমাণ করে।

তথ্যসূত্র

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, বিচিত্র প্রবন্ধ, 'বাজে কথা', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা ১৪০১, পৃ. ৫৯

২। তদেব, পৃ. ৫৯

৩। চট্টোপাধ্যায় হীরেন, 'সাহিত্য প্রকরণ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৪০৬, পৃ. ২২১

৪। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'পুলের ধারে', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৯৩

৫। তদেব, পৃ. ৯৫

৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, বিচিত্র প্রবন্ধ, 'ভূমিকাংশ', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৪০১, পৃ. ৭

৭। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'আষাঢ়ে গল্প', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ১৩৬

৮। তদেব, পৃ. ১৩৬

৯। তদেব, পৃ. ১৩৭

১০।ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'আষাঢ় ও শ্রাবণ', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ১৩৯

১১।তদেব, পৃ. ১৩৯

১২।তদেব, পৃ. ১৩৯

১৩।তদেব, পৃ. ১৩৯

১৪।তদেব, পৃ. ১৩৯

১৫।তদেব, পৃ. ১৩৯

১৬।তদেব, পৃ. ১৩৯

১৭।ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'বসন্তের কবিতা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ১৩৫

১৮।ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'শ্রাবণের বারিধারা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ১৭৮

১৯।তদেব, পৃ. ১৭৯

২০।ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘জানালার ধারে’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৪০২

২১।ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘ক্ষণিক শূন্যতা’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭১, পৃ. ২৮৩

২২।ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘পুরাতন চিঠি’, ব্রন্দ্রেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৪৩০

২৩।তদেব, পৃ. ৪২৯

২৪।তদেব, পৃ. ৪৩০

২৫।ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ‘অশ্রুজল’, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ. ১৭৭

২৬।জোয়ারদার দেবদাস, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২-৩

সপ্তম অধ্যায়

বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের শৈলী বিচার

সপ্তম অধ্যায়

বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের শৈলী বিচার

> ''...রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিতভাবে বুঝায়, কিন্তু বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের।''[১]

আবার,

> ''ভাবের জিনিসকে ভাষার...নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যিকের কাজ।''[২]

সুতরাং, সাহিত্য বিচারে 'ভাব' এর সঙ্গে সঙ্গে ভাব প্রকাশের উপায় সম্পর্কিত অনুধাবন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। আর ভাবপ্রকাশের উপায় যখন বিশেষভাবে প্রাবন্ধিক বা লেখকের তখন শৈলীচর্চায় এই উপায়ের মধ্যেই লেখকের বিশিষ্টতার সন্ধান করা হয়। অপরদিকে, সাহিত্যের অন্যতম কাজ 'ভাবের জিনিসকে ভাষার' করে তোলা। আর এই ভাবের জিনিসকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করার উপায় হল ভাষা। তাই শৈলীচর্চার ক্ষেত্রে, ভাষার দুয়ার দিয়েই কবি-সাহিত্যিকের বিশিষ্টতার অন্দরমহলে পৌঁছানো সম্ভব হয়। শৈলী বিজ্ঞান এদেশে শিল্পতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও ভাষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিচিত আগন্তুক বলে মনে হলেও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বিচার পদ্ধতিতে 'রীতি' কথাটি সুপরিচিত। লেখকের অন্তরে লুকিয়ে থাকা চেতনা, আবেগ ও কল্পনা ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার জন্য বিশেষ ধরণের শব্দ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এক এক লেখকের এক এক ধরনের ভাষা-প্রকাশভঙ্গিমা। আবার স্থান কাল পাত্র ভেদে একই লেখকের রচনারীতির মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য ঘটতে পারে। আলংকারিক বামন রীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন— ''বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ''[৩]— বিশেষ ভঙ্গিতে শব্দবিন্যাসই রীতি। এই ভঙ্গি আবার বিষয়ভেদ, অবস্থাভেদ বা অঞ্চলভেদেও পৃথক হতে পারে। রীতির উৎকর্ষের জন্য রচনা স্বাদু ও আকর্ষণজনক হয়। আর এর ব্যতিক্রম ঘটলে অশেষ গুণসম্পন্ন রচনাও গ্রাহ্য হয় না। তবে একথা সত্যি যে শুধু রচনারীতি ও ভাষাভঙ্গির তির্যকতার গুণে কোন কোন লেখক

বা কবি দীর্ঘজীবি হন। যেমন— অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র। ব্যক্তিভেদে ও ঐতিহাসিক ক্রমভেদে রচনা বৈচিত্র্যও ঘটতে পারে। যেমন— প্রাক্ শেক্সপিয়রিয় রীতি, মধ্যযুগীয় রীতি, কেল্টিক রীতি, গীতিকবিতার রীতি ইত্যাদি। প্রত্যেক রীতিরই পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকে। এই প্রসঙ্গে জর্জ লুই বুফোঁর discourse Sar le Style (1753) গ্রন্থের বিখ্যাত উক্তি— 'Style is the man himself' এর মন্তব্য মনে পড়ে যায়। যথাস্থানে যথার্থ শব্দ প্রয়োগকে ফ্লবেয়র শ্রেষ্ঠ রীতি বলেছেন। আবার শোপেনহাউয়ের মতে স্টাইল হচ্ছে মনের ভাষা আশ্রয়ী বহিঃপ্রকাশ। আর ভারতীয় আলংকারিক বামন রীতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সেকথা তাঁর 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' বাক্য থেকেই বোঝা যাবে। সংস্কৃতে 'রীতি' ও ইংরেজি Style এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। সংস্কৃত রীতি হচ্ছে স্বীকৃত শিল্পগুণের সমন্বয়ের দ্বারা গড়ে ওঠা বহিরঙ্গগত রচনাপদ্ধতি যা একান্তভাবে বস্তুগত; অপরদিকে Style হচ্ছে লেখকের ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন। সুতরাং বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে প্রভেদ, রীতি ও Style এর মধ্যেও সেই ভেদ।

গদ্য যে ভাষা শিল্পের অন্যতম অঙ্গসজ্জা ইউরোপে সপ্তদশ শতকের লেখকগণই তা উপলব্ধি করেছিলেন। ড্রাইডেন তাই মনে করেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে একমাত্র ভাষার পদ্যরূপই তার একমেবাদ্বিতীয়ম্ রূপকল্প নয়, গদ্যরূপের দ্বারাও ভাষার পূর্ণতর সৌন্দর্য বিকশিত হতে পারে। গদ্যের অনবশেষ সম্ভাবনার কথা কেবলমাত্র ড্রাইডেন কিংবা এজরাপাউন্ড উপলব্ধি করেছিলেন তা সর্বাংশে সত্য নয়। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এমন কি তাঁরও পূর্বে ফরাসী লেখক মলিয়ের পর্যন্ত গদ্য সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছিলেন।

বাক্রীতি ও ব্যক্তিত্বের দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্কই বক্তব্যকে সাহিত্যে চিরায়ত মর্যাদা দান করে। কাঠামোকে যখন বিশেষভাবে সাজিয়ে তার মধ্যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করা হয় তখনই অঙ্গরূপের জন্মলাভ। শব্দকে কেবলমাত্র অর্থের সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ করে রাখার কোন সার্থকতা নেই। মানুষের অনুভূতিতে সাড়া জাগানোতেই শব্দের সার্থকতা, ভাষার নব-রূপায়ণ। রবীন্দ্রনাথ 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় তাই লিখেছিলেন—

"মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে
ঘুরে মানুষের চর্তুদিক। অবিরত রাত্রি দিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।।"[৪]

শব্দের নতুনতর কাজ হল মনের অনির্দেশ্য অনুভূতিকে রূপ দেওয়া। ভাবকে সারময় করে তোলা। এক্ষেত্রে শিল্পীর শিল্পকলা, তাঁর প্রয়োগ কৌশলকে কখনই অস্বীকার করা যায় না।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাতেও এমন স্বভাব বৈশিষ্ট্য দুর্লক্ষ্য নয়। একদিকে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে তিনি বিষয় নিষ্ঠ ও মননশীল, অন্যদিকে রচনারীতিতে রমণীয়তা ও লাবণ্য সৃষ্টিতেও সমান আগ্রহী। এ বিচারে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রিয়নাথ সেন একারণেই বলেছিলেন—

> ''বলেন্দ্রনাথের ইহা কম প্রশংসার কথা নয় যে প্রথম হইতেই তাঁহার রচনা প্রণালী তাঁহার নিজের এবং তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা আর স্পষ্ট নিদর্শন কি থাকিতে পারে যে, সমস্ত বঙ্গদেশ যখন রবীন্দ্রনাথের বীণা ঝংকারে কম্পিত উচ্ছলিত...বলেন্দ্রনাথ তাঁহার ঘরের— তাঁহার সেই শিক্ষাগুরুর প্রভাব হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।''[৫]

তাই দেখা যায়, অতিদ্রুত তিনি তাঁর মনের উপযুক্ত ভাষা শৈলী নির্মাণ করেছেন এবং তারই উপর নির্ভর করে আছে তাঁর গদ্যরীতির স্বাতন্ত্র্য তথা 'স্টাইল'।

শৈলী বা স্টাইলের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। সাধারণভাবে স্টাইল বলতে বোঝায় লেখকের মানস প্রতিফলন। স্টাইলের মধ্যে একটা ব্যক্তিময়তা ও স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা যেমন থাকে, তেমনি ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি হলেও ব্যক্তিত্বের পরিণতিকে অতিক্রম করার বিশিষ্ট ক্ষমতাও তার মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত হয়েও তা নৈর্ব্যক্তিক। আর এর মধ্যেই প্রতিফলিত হয় লেখকের মন-জীবন, আত্মিক স্বরূপ। এজন্যই বলা হয় Style is the man himslef'-এখানেই রচনা ও রচয়িতার অদ্বয়ত্ব।

অষ্টাদশ শতকে ড্রাইডেন বলেছিলেন 'ভাষা চিন্তার পোশাক' (language is the dress of thought)[৬] এবং 'স্টাইল পোশাকের বিশেষ নির্মিতি' (Style is the Particular cut and fashion of the dress)[৭]। তাঁর মতে ভাষার বিশেষ নির্মিতি তথা স্টাইল হবে সম্পূর্ণ বিষয়ানুগ, বিষয়ের বিভিন্নতা অনুসারে স্টাইলের প্রকারভেদ ঘটবে। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিতে

এমনই চিত্র নৈপুণ্য মুখর হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে ক'জন গদ্য শিল্পী বাংলা গদ্য সাহিত্যকে শিল্প সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে তুলেছিলেন, বলেন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরও বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতিতে আকৃষ্ট হয়ে বলেছেন—

> ''বলেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গীই আমাকে এ বিষয়ে আকর্ষণ করিয়াছিল। এমন সযত্নে গাঁথা শব্দের মালা তার পূর্বে আমি দেখি নাই। শুনিয়াছি বলেন্দ্রের ভাষা তাঁহার সাধনার ফল। শিক্ষানবিশি অবস্থায় কাটিয়া ছাঁটিয়া পালিশ করিয়া তিনি ভাবের উপযোগী ভাষা গড়িয়া লইয়াছিলেন। তিনি অলঙ্কারের বোঝা চাপাইয়া ভাষাকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা দিবার চেষ্টা করিতেন না। কিন্তু শব্দগুলিকে বিশেষ বিবেচনার সহিত বাছিয়া লইয়া, কোথায় কোনটি বসাইলে ভাল মানাইবে, স্থির করিয়া ও গাঁথনির দৃঢ়তার দিকে নজর রাখিয়া তিনি যত্নের সহিত শব্দের মালা গাঁথিতেন। কাজেই তাঁহার ভাষা কারিকরের হাতের অপূর্ব কারুকার্য লইয়া দাঁড়াইয়াছিল।''[৮]

ঊনবিংশ শতকের শেষপাদ মাত্র বলেন্দ্রনাথের জীবৎকাল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতক, বিশেষ করে ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ- এক গৌরবময় যুগ। ১৮৫০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে এবং ভারতে, বঙ্গীয় ও ভারতীয় জনসমাজের এমন কি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এক অভিনব ও নবজাগৃতি দেখা দিয়েছিল। চিন্তাজগতে ও কর্মজীবনে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, রাষ্ট্রীয় ভাবনায় ও রাজনীতিতে, বিশ্বচেতনায় নতুন কিছু দেখবার ও বুঝবার এক প্রেরণা কাজ করেছিল। ভারতের এই পুনর্জাগৃতি ঘটে প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের মাধ্যমে— ইংরেজী সাহিত্য সংস্কৃতির প্রসার ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংস্কৃতের চর্চা। তাছাড়া, ঠাকুর পরিবারে সংস্কৃত ও ইংরেজি দুই সাহিত্যেরই সমান চর্চা হত। সেই পরিবেশের প্রভাব বলেন্দ্রনাথের উপর যে পড়বে এটাই স্বাভাবিক।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের গভীর যোগ ছিল। এ সম্পর্কে তাঁর সংস্কৃত বিদ্যার আবাল্য অনুশীলনের কথা নানাভাবে উল্লেখ করেছেন সমসাময়িক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংস্কৃত সাহিত্যের রসভাণ্ডারে যেন তিনি

তাঁর অনুকূল আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদনে প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথের প্রথম প্রবেশ যে কালিদাসের 'মেঘদূত' প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা আগের অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্র কল্পনায় তখনো কালিদাস অনুভবের স্ফূর্তি ঘটেনি। আসলে সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনায় বলেন্দ্রনাথের সবচেয়ে ঝোঁক বেশি ছিল কালিদাসের প্রতি। ফলে, বলেন্দ্রনাথের স্বাধীন চিন্তার পাশাপাশি সংস্কৃত সাহিত্যের শব্দরুচি, গাম্ভীর্য, প্রলম্বিত মন্থর বাক্যবিন্যাস- এ সবই তাঁর রচনায় স্ফূট হতে লাগল।

বলেন্দ্রনাথের রচনার ভাব যেমন নতুন, ভাষাও তেমনি নতুন। এ ভাষা বুদ্ধি ও যুক্তির ভাষা নয়; তথ্য বিন্যাস কিংবা তত্ত্ব-ব্যাখ্যার ভাষাও নয়, এ ভাষা অনুভূতি প্রকাশের ভাষা। স্বভাবতই তিনি প্রত্যেকটি প্রবন্ধে বিষয়বস্তু ও ভাবের অনুকূলে ভাষার সৃষ্টি করেছেন। প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির সমতারক্ষা বলেন্দ্র কৃতিত্বের পরিচায়ক। কাজেই, এ ভাষায় সূক্ষ্ম কারুকাজের অবকাশ বেশি, আভাস ইঙ্গিতে যেন অনেকখানিই বলা হয়ে যায়।

আমরা জানি, গদ্য হল ভাষা ও সাহিত্যের মেরুদণ্ড। এখানে চিন্তার উজ্জীবন ঘটে। কিন্তু শুধুমাত্র লেখকের চিন্তাশক্তির দ্বারাই গদ্য সাহিত্যের সম্পূর্ণতা আসে না। কিছু কিছু রীতি পদ্ধতিকে স্বীকার করে নিতেই হয়। তাই ভাষারীতির ক্ষেত্রে বাংলা নিজস্ব কথ্য ভাষার রীতি ছাড়াও আরও দুটি ধারার অস্তিত্ব চোখে পড়ে। একটি ধারা ইংরেজি বাক্য গঠনরীতি অপরটি সংস্কৃত বাক্যগঠন রীতি। এই তিনটি ধারা একত্রে মিলিত হয়ে বাংলা গদ্য ভাষায় বলিষ্ঠতা যেমন এনেছে তেমনি বাংলা গদ্যকে আধুনিক করে তুলেছে। বলেন্দ্রনাথও এই রীতি নিয়মের বাইরে থাকতে পারেন নি। যাই হোক, বাংলা গদ্যের লিখিত রূপের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতিতে ইংরেজী বাক্য বিন্যাস ও পদবিন্যাসের প্রভাব সবিশেষ কার্যকরী ছিল। ভাষা ক্রমশ কল্পনার সূক্ষ্মতর ও বিচিত্রতর প্রকাশের উপযোগিতা লাভে তৎপর হয়ে উঠেছিল। তাই শুধুমাত্র বাক্যসজ্জা বা শব্দসজ্জাতেই ভাষারীতি সীমাবদ্ধ থাকেনি। ইংরেজী সাহিত্যের অলংকার বা 'রেটরিক'-এর প্রতি বাঙালী গদ্যকারেরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ফলে বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি ঘটেছিল অনায়াসেই। উইলিয়াম কেরি থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সকলেই এই গদ্যরীতির সমৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। আমার আলোচ্য প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথও ব্যতিক্রম নন। এই অধ্যায়ে আমি বলেন্দ্রনাথের ভাষা বিশ্লেষণ করে তার বাক্যসজ্জা, শব্দসজ্জা, অলংকার সজ্জার বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে সচেষ্ট হয়েছি।

বাক্যবিন্যাস

শব্দের মালা গেঁথেই সৃষ্টি করা হয় বাক্য, সুতরাং, শৈলীচর্চায় শব্দের পাশাপাশি বাক্যগঠনের প্রতিও দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। একটি সুন্দর বাক্য হল কতকগুলি অর্থযুক্ত পদের সুসজ্জিত বিন্যাস। এমন বিন্যাসেই গড়েওঠে বাংলা বাক্যের সাধারণ অবয়ব, ফার্দিনন্দ দ্য সোস্যুর ভাষাতত্ত্বের সনাতনপন্থা পরিত্যাগ করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'অবয়ববাদ' (Structuralism) এর। অবয়ববাদীরা মুখের ভাষাকে ভাষা বিচারে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বাক্যের অবয়ব বিচারে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তন্ময়, নিরাসক্ত। আর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চমস্কি দেখালেন সীমিত শব্দ সংখ্যা আর বাক্য গঠনরীতির বাঁধা পথ ধরে সংবর্তনের সহায়তায় অসংখ্য বাক্যের সঞ্জনন (Generative) সম্ভব। তিনি মনে করেন সংবর্তনী (Transformational)র নিয়মে একটি বীজবাক্যের বিভিন্ন উপাদানে পুনর্বিন্যাস ঘটে যখন বাক্যটি সরল, কর্তৃবাচীয়, ঘোষণামূলক রূপ থেকে নেতিবাচক বা প্রশ্নবাচক বা আদেশ অনুসরণে নতুন নতুন বাক্যের সৃষ্টি করতে পারে। পরবর্তীকালে চমস্কি 'Aspects of the Theory of syntax' গ্রন্থে বাক্যের অবয়ব বিষয়ে দুটি স্তরের উল্লেখ করেছেন— একটি 'বহিরঙ্গ রূপ' (Surface Structure) অপরটি 'অন্তরঙ্গ রূপ' (deep structure)। আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানে চমস্কি-প্রদর্শিত বাক্যের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ রূপকেই মানা হয়। একটি ব্যাকরণসম্মত বাক্যের পক্ষে ক্রিয়াপদ (verb) আবশ্যিক। বাংলা বাক্যে বর্তমানে 'হওয়া' ক্রিয়া বহিরঙ্গ রূপের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে। এই ক্রিয়াপদটি বাংলা বাক্যে অন্তরঙ্গ রূপের অন্তর্গত। যেমন,—

উত্তম ভালো ছেলে (বহিরঙ্গ রূপ)

উত্তম (হয়) ভালো ছেলে (অন্তরঙ্গ রূপ)

উনিশ শতকের প্রাথমিকপর্বের বাংলা গদ্য রচনায়, প্রধানত ইংরেজ মিশনারিগণ এবং কোন কোন বাঙালি গদ্যকার, এ ধরনের ইংরেজী বাক্যের (Uttam is a Good boy) বহিরঙ্গ রূপের অনুসরণ করেছিলেন। যেমন—

পস্ট(স্পষ্ট) রূপে প্রকাশ করিবার শিল্পবিদ্যা 'হয়' ব্যাকরণ।— (গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ইংরেজি ব্যাকরণ)

অথবা

ক্রিয়াত্মক বিশেষণ দুইপ্রকার 'হয়'। (রামমোহন, গৌড়ীয় ব্যাকরণ)

বা

যে পুরুষের চরণপদাঙ্কিত 'হয়' সে অবশ্য মহারাজ 'হয়' (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, বত্রিশ সিংহাসন)

তবে বাংলা বাক্যের গঠনে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই আমরা যে বাঁক লক্ষ্য করেছিলাম গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে তা ক্রমেই নাবালকত্বের সীমা উত্তীর্ণ হয়েছে।

বাক্যের সাধারণ সজ্জা:

আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানীরা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যাবলীর প্রকৃতি পরীক্ষা করে মোটামুটি ছয় ধরণের সজ্জার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন—

১)কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV)

২)কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম (SVO)

৩) ক্রিয়া-কর্তা-কর্ম (VSO)

৪)ক্রিয়া-কর্ম-কর্তা (VOS)

৫)কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া (OSV)

৬)কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা (OVS)

আমরা জানি বাংলা বাক্যের সাধারণ সজ্জা হচ্ছে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV) আর ইংরেজী বাক্যের সাধারণ সজ্জা কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম (SVO)। অর্থাৎ বাংলা বাক্যে ক্রিয়ার অবস্থান কর্তা ও কর্মের পরে আর ইংরেজি বাক্যে ক্রিয়ার অবস্থান এ দুয়ের মাঝখানে।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যে বাংলা বাক্যের সাধারণ সজ্জাই লক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে ইংরেজী বাক্যগঠন রীতিকে তিনি অনুসরণ করেননি। কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করে এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণে সচেষ্ট হবো। যেমন—

> ''আমাদের ভাষায় যেমন শুভ এবং শোভা শব্দের একই ধাতু,
> তেমনি ভারতবর্ষীয়ের মনের মধ্যেও মঙ্গল এবং সুন্দর একত্র
> মিশিয়া আছে।''[৯] (SOV)

বা

> ''আমাদের পাপের অন্ত নাই— সাধ করিয়া আমরা পরের হৃদয়
> লইয়া টানাটানি করি, পরের মনে কষ্ট দিয়া সুখী হই...''[১০]

আগেই উল্লেখ করেছি যে বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্বে বর্তমান কালে 'হওয়া' ক্রিয়াপদের ব্যবহার ছিল। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই 'হওয়া' ক্রিয়াপদের ব্যবহারকে বাদ দিয়েছিলেন

তাঁর প্রবন্ধের বাক্য সজ্জাতে। বাংলার নিজস্ব ভাষারীতির অনুসরণে এই ধরনের ক্রিয়াপদের ব্যবহার উহ্য রেখে দিলে বাক্যের প্রকাশ ক্ষমতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়না যে তার প্রমাণ বলেন্দ্রনাথ রেখেছিলেন, যেমন—

"বৈশাখের প্রখর রবিকিরণে আমার জন্ম— জন্মাবধি রবিকিরণ
পান করিয়া এ দেহ গঠিত।"[১১]

কিংবা

"আমাদের জন্ম দিয়া পুণ্যভূমি চিরদুঃখিনী।"[১২]

তবে বাক্যকে শ্রুতিমধুর করে তুলতে বাক্য সজ্জায় লেখকের স্বাধীনতা থাকে। এক্ষেত্রে পদ বিন্যাসের পরিবর্তন সাধিত হয়। আর এ বিষয়ে বাংলা ভাষা যেন ইংরেজি ও সংস্কৃতের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। কারণ সজ্জাবৈচিত্র্যের সঙ্গে শৈলীবৈচিত্র্য সম্পর্কান্বিত। পদসজ্জাকে এলোমেলো করে বিভিন্ন ভাবে বাক্যরচনা বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে যেমন—

"রাম পদাঘাতে যদুর নাক ভেঙেছিলেন।" এই বাংলা বাক্যটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কর্তা (রাম), কর্ম (নাক), করণ (পদাঘাত), সম্বন্ধ পদ (যদুর), ক্রিয়াপদ (ভেঙেছিল)। বাংলা এই বাক্যটি বিভিন্ন পদসজ্জায় সাজানো যেতে পারে। যেমন—

'পদাঘাতে রাম ভেঙেছিলেন যদুর নাক। পদাঘাতে রাম যদুর নাক ভেঙেছিলেন। যদুর নাক রাম পদাঘাতে ভেঙে ছিলেন। রাম যদুর নাক ভেঙেছিলেন পদাঘাতে।

পদসজ্জাকে এ ধরনের এলোমেলো করে বিভিন্নভাবে বাক্যরচনা বাংলা ভাষায় যতটা গৃহীত হয়েছে ইংরেজি ভাষায় ততটা নয়। ফলে বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতিতেও এরূপ বৈশিষ্ট্য অনায়াসেই চোখে পড়ে। কখনও বলেন্দ্রনাথের গদ্যে কর্তৃপদের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন— 'জানিয়া, না জানিয়া বাসনার পূজার জন্য কতবার কত সুকুমার হৃদয়ে আঘাত দিয়াছি..."[১৩]

বা

"না জানি, কোন সন্ধ্যার স্বপনে, কেন ফুলবনে কি শুভ ক্ষণেই
তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিলে"[১৪]

আবার কখনবা কর্তৃপদ অবস্থানের স্বাভাবিক নিয়মবিরুদ্ধ স্বভাব বলেন্দ্রনাথের গদ্য রীতিতে লক্ষিত হয়। যেমন—

"প্রাচীন কালকে আমরা কেমন মধুর বলিয়া কল্পনা করি।"[১৫]

বা

"শ্যামল জননীর প্রস্ফূটিত হাসিমুখ আমরা আর দেখিব না।"[১৬]

অথবা

"স্নেহময়ী জননীর শ্যামল ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারের রৌদ্রতপ্ত পথে পথে নয়নলোর সম্বল করিয়া আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।"[১৭]

'এবং' দিয়ে বাক্য শুরু :

'এবং' শব্দ দিয়ে বাক্য শুরু করার প্রবণতা বলেন্দ্রনাথের রচনার একটি প্রধান বিষয়। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায়ে রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রমুখের রচনায় 'এবং' দিয়ে বাক্য শুরুর প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত কিংবা বিদ্যাসাগরের রচনার মধ্যে এই প্রভাব দেখা যায় না। আবার পরবর্তীকালে ভূদেব চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথের গদ্য রচনায় এই ধরনের অতিরিক্ত ব্যবহার আবার ফিরে এসেছিল। ইংরেজি বাইবেল এবং জন বানিয়ান এর দি পিলগ্রিমস্ প্রগেস (The Pilgrims Progress) গ্রন্থের ধারা অনুসরণ করে 'এবং' দিয়ে বাক্য শুরুর প্রভাব পড়ে বাংলা গদ্যে। বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতিতে 'এবং' দিয়ে বাক্য শুরুর পরিচয় মেলে যেকটি প্রবন্ধে তা নিম্নে উপস্থিত করছি—

ক) "...। এবং গভীরতার পরে রচিত গ্রন্থগুলির সমকক্ষ না হইলেও ঋতুসংহারেই উদীয়মান কবির অসাধারণ প্রতিভার প্রথম পরিচয়।"[১৮]

খ) "...। এবং এই মৃত্যু হিম বিবর্ণতাটুকু ঢাকিবার জন্যই বাহিরের সাজসজ্জা ও সমারোহবাহুল্য অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে।"[১৯]

গ)"...। এবং শিক্ষার বিস্তারের সহিত অল্পে অল্পে ইংরাজি ভাষায় দেশ ছাইয়া ফেলে।"[২০]

ঘ)" ।...এবং উৎকলীয়েরা তাঁহাদের অধীনে জন খাটিত মাত্র?"[২১]

ঙ)"...। এবং তোমারই চারুচরণ নখমণিপ্রভায় আমাদের পুরাতন গৃহকোণ নূতন সৌন্দর্য্যে ও শোভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।"[২২]

চ)"...। এবং উন্মুক্ত প্রাসাদ বাতায়নসকল হইতে কুল ললনাগণের কুবলয় দৃষ্টি নিপতিত হইয়া এই উষ্ণীষ খচিত বিবিধ বেশ বর্ণবৈচিত্র্যকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলে।"[২৩]

যতিচিহ্নাদির ব্যবহার :

দুরান্বয় দোষ থেকে মুক্তি তথা ভাষার সহজবোধ্যতার জন্য যতি চিহ্নাদির যথাযথ প্রয়োগ প্রয়োজন। সংস্কৃতে এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় এক দাঁড়ি এবং দুই দাঁড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বাংলা গদ্যে যতি চিহ্নাদির ব্যবহার ইংরেজি রীতির অনুসরণে ঊনবিংশ শতক থেকেই শুরু হয়। এই রীতিরই সম্যক রক্ষণ বলেন্দ্রনাথের গদ্যে দেখা যায়। তবে, এই কষি বা ড্যাশের ব্যবহার ভূদেব, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বিবেকানন্দ কিংবা বলেন্দ্রনাথের পূর্বে বিরল ছিল। এঁদের গদ্যরীতিতে কষির ব্যবহার নিয়মিত হয়ে আসে। বিবেকানন্দের গদ্যরীতিতে এর প্রমাণ মেলে। যেমন—

"ফ্যাশনটা কি, না-ঢঙ, মেয়েদের কাপড়ের ঢঙ— প্যারিস শহর থেকে বেরোয়, পুরুষদের-লণ্ডন থেকে।"[২৪] (পোশাক ও ফ্যাশান)

বলেন্দ্রনাথের বেশ কিছু প্রবন্ধে কষি ব্যবহারের অধিক প্রবণতা লক্ষিত হয়। নিচে কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি তোলা হল—

ক) "এই অদৃশ্য প্রভাব-এই ছায়া-শুধু সঙ্গীতের স্মৃতির মত— অত্যন্ত রহস্যময়, কিন্তু এই রহস্যবশতই প্রিয়তর।"[২৫]

খ)"আর সে মহান সৌন্দর্য্য— গম্ভীর শোভা—সুমধুর পবিত্রতা নাই।"[২৬]

গ)"এখানে একটা অপরিচিতের মধ্যে পরিচিতের ভাব— পুরাতনের মধ্যে নূতনত্ব— বিস্মৃতির মধ্যে স্মৃতি।"[২৭]

ঘ)"দুঃখের শুধু কাহিনী— গঙ্গাতরঙ্গের স্নেহমাখা গীতগুলির মৃদু কল্লোল— লাজুক ঊষার রক্তিম রাগের কোমল চুম্বন— সাঁঝের আকাশের স্নিগ্ধতার স্বপন— ঝরান বায়— মৃতপ্রায় রজনীর শেষ আশা।"[২৮]

শব্দসজ্জা

বাক্য বিন্যাসের পর যেটি গদ্যসাহিত্যের শৈলী বিচারে আলোচিত হয় সেটি হল শব্দসজ্জা। শব্দসজ্জার গুরুত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। কেননা, একটি সুসংহত অর্থবোধক বাক্যের গঠনগত সৌন্দর্য নির্ভর করে সঠিকস্থানে সঠিক শব্দ প্রয়োগের উপর। তাই বক্তব্যের অন্তর্গত রহস্যময়তাকে ফুটিয়ে তুলতে যেমন ধ্রুপদী সাহিত্যগুণ বলেন্দ্রনাথ ভাষায় এনেছেন তেমনি রোমান্টিক গদ্যের স্বভাবগুণ সঞ্চারের প্রেরণায় বাংলা প্রাকৃত ভাষার স্বভাবকেও কাজে লাগিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলেন্দ্রনাথের রচনায় যে জিনিসটি পরিলক্ষিত হয় তা হল তাঁর সুনির্বাচিত সাধুশব্দ সংগ্রহ। যদিও এ ব্যাপারে তিনি পথিকৃৎ নন। কারণ বলেন্দ্রনাথের আগে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রমুখের রচনায় এমন বহু সাধুশব্দ আমরা দেখতে পেয়েছি। তবুও বলেন্দ্রনাথের সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে একটা বিশেষত্ব ছিল। যুক্ত ধ্বনি ব্যবহার করলেও প্রধানতঃ কোমল ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতিই তাঁর আগ্রহ ছিল। এটা বিশেষকরে বুঝতে পারা যায় সুপ্রচুর অনুপ্রাস প্রয়োগে। তাঁর অনুপ্রাস ব্যবহার অনেক বেশি অনায়াস। যেমন—

'শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীতজড়িত হস্তে'[২৯]

কিংবা

''বসন্ত কিছুতেই বিজন বিরহ সহিতে পারে না।''[৩০]

ব্যঞ্জনধ্বনির এই আবর্তনই গদ্যকে শ্রুতিমধুর করে। অনুপ্রাসের বহুল ব্যবহারে অনেকসময় গদ্য পীড়িত হয়— বলেন্দ্রনাথ তা ভালোভাবেই জানতেন। অনুপ্রাস শুধু ব্যঞ্জনের নয়, স্বরধ্বনির অনুপ্রাসও ভাষাকে মাত্রাগুণযুক্ত করে। তাতে ভাষায় সংগীত মাধুর্য আসে। 'কণারক' প্রবন্ধে এই ধরনের সার্থক অনুপ্রাস ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়— ''পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে, হিমশিলা-খণ্ডোপরি বিষধর ফণিনীকুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রামসুখে লীন হইয়া আছে।''[৩১] এখানে কয়েকটি ব্যঞ্জন অনুপ্রাস ছাড়াও ই-কারের পুনরাবর্তনেও ভাষার ধ্বনি-মহিমা রচিত।

বলেন্দ্রনাথ যে শব্দরীতির অনুসরণ করেছেন, সে রীতি বস্তুত রবীন্দ্রনাথেরই প্রবর্তন। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি ভাষাকে আর্ট হিসাবে চর্চা করেছেন— শুদ্ধশিল্পবাদীরা যাকে বলেন— 'Perfumed Prose'। তাই তাঁর শব্দচয়নের লক্ষ্য করি চিত্রধর্ম ও ব্যঞ্জনাধর্ম। চিত্রধর্ম তাঁর ভাষায় গড়ে তোলে রং ও রেখার অপূর্ব কারুকাজ। তাই তিনি রচনা করেন—

''সে কবিতা মলয় সমীরণের মত হু হু বহিয়া যায়, বাসন্তী জ্যোৎস্নার মত স্মৃতিতে ছাইয়া ফেলে, প্রবল বন্যার মত হৃদয় প্লাবিত করিয়া দেয়।''[৩২]

বা

''নীলিমার স্বপন উপকূলে দুইখানি সান্ধ্য হৃদয়ের গভীর নৈরাশ্য ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল। ধরণীর নীল চন্দ্রাতপে একটি নীলাভ জ্যোতি চমকিয়া উঠিল।''[৩৩]

শব্দের নতুনতর কাজ হল মনের অনির্দ্দেশ্য অনুভূতিকে রূপ দেওয়া— ভাবকে পরিস্ফুট করে তোলা। এজন্য শব্দসজ্জায় অনায়াসভাবেই আসে অলংকার উপমার ব্যবহার। ফলে, ভাষায় আসে চমৎকারিত্ব ও প্রাণের স্পন্দন।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অনেক নতুন ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ করেছেন যেমন—

হেয়ার-ওয়াশ, ডিনার, স্ট্যাটিস্টিক্স্, ক্রিমিন্যাল, টেকনিক, গ্যালান্ট্রী, ক্যাটালগ, ট্রেডমার্ক (ছাপ) ইত্যাদি।

পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আসাবাবপত্র বিষয়ে 'বেনোজল' প্রবন্ধে অনেকগুলি ইংরেজি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়—

কার্টেন, সার্টিন, লেস্, রিবন, সার্জ, টুইড, জার্সি, কার্ডিগান, রেপার,রগ্, টি-কোজি, কার্পেট, ক্যুশন, ফ্ল্যানেল ইত্যাদি।

ইংরেজী শব্দের সঙ্গে বাংলা শব্দের সমাস করে অনেকসময় ইংরেজি শব্দকে বাংলা গদ্যে নিজস্ব সম্পদ করে তুলেছেন বলেন্দ্রনাথ। যেমন—

ডিনার-আসনে, জীবন-ট্রাজেডি, স্টীম-লাঙ্গল, কমপ্লিমেন্টমুখে।

বাংলা বাক্যে ইংরেজি শব্দ এইভাবে অনায়াসে অত্যন্ত আপন হয়ে উঠেছে। ফলে ইংরেজি শব্দ বাংলাবাক্যে আগন্তুক বলে মনে হয় না। দু'একটি উদাহরণের সাহায্যে এই সত্যের যাথার্থ্য নিরূপন সম্ভব। যেমন—

ক) 'ক্রমশঃ আমাদের উৎসবগুলি 'আপিসী' ছাঁচে গড়িয়া উঠিতেছে।'[৩৪]

খ)''এই ফেসানানুসারী' রহস্য-দলই বর্ত্তমান বাঙ্গালায় 'সেন্টিমেন্ট্যাল' পদবাচ্য''।[৩৫]

গ)"BLUSH করা কিন্তু উভয় দেশেরই সাধারণ প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়।"[৩৬]

এই সকল বাক্যে অনায়াস পটুতায় বলেন্দ্রনাথ ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ, পড়তে পড়তে কখনোই আমাদের থমকে দাঁড়াতে হয় না। সহজ সাবলীল গতিতে একেবারে আপন মেজাজে এরূপ শব্দগুলিকে বাংলা বাক্যের মধ্যে সাজিয়ে নিয়েছেন মিলিয়ে মিশিয়ে। কিন্তু বাংলাবাক্যের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা বিদেশী চেহারার প্রভাবে কখনোই বিনষ্ট হয়নি।

বাংলা গদ্যের নিজস্ব কথ্যরীতির সঙ্গে ইংরেজি বাক্য এবং শব্দ গঠনের এক অপূর্ব মিলন যেমন দেখা যায় বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে তেমনি বাংলা গদ্যরীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধারা সংস্কৃত বাক্য গঠনরীতিও দুর্লক্ষ্য নয়। আমরা জানি যে, লেখক বলেন্দ্রনাথের রসচেতনা প্রথম থেকেই সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরেজি সাহিত্যের আস্বাদনে সমানভাবে উৎসাহিত। এ বিষয়ে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন—

> ‘‘অল্পবয়স থেকেই বলুদাদা সাহিত্যরসে মাতোয়ারা ছিলেন। তিনি সংস্কৃত বাংলা ইংরেজিতে যখন যে-কোনো বই পড়তেন, কাকিমাকে সেগুলি একবার পড়ে না শোনালে তাঁর তৃপ্তি হত না। বলুদাদার কাছ থেকে শুনে শুনে মায়ের এই তিন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে বেশ ভালো করেই পরিচয় হয়েছিল।’’[৩৭]

কালিদাস, বাণভট্টের শব্দচয়নরীতি রবীন্দ্রনাথের মতো বলেন্দ্রনাথেরও প্রিয় বিষয়ের মধ্যে অন্যতম। এ প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ সেনের উক্তিটি স্মরণযোগ্য—

> ‘‘শব্দ চয়নে বলেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা— এক একটি কথা এক একটি চিত্র ---- এমন পূর্ণ প্রাণ-পূর্ণঅবয়ব কথা বাংলা গদ্যে কোথাও দেখি নাই।...সে ভাষা কোথাও নিতান্ত সহজ সরল, ভদ্র গৃহস্থের গৃহ প্রাঙ্গনের ন্যায় অলংকারশূন্য--- কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ---- কোথাও বৃক্ষবটিকার ন্যায় বিবিধ ফলপুষ্পাভরণে বিচিত্র— এবং কোথাও নক্ষত্র নিবিড় অনন্ত নৈশ গগনের ন্যায় সমুজ্জ্বল।’’[৩৮]

সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনায় সংস্কৃত বাক্যগঠনরীতির অনুসারী ভাষার প্রসাধন কলা,

অলংকৃত বাক্‌বৈভব, সমাসবদ্ধ বাক্যাংশগুলির মন্থর পদবিক্ষেপ অধিকতর স্পষ্ট হয়ে দেখা গিয়েছে। তৎসম শব্দ সমন্বিত সমাসবদ্ধ বাক্যাংশগুলি বর্ণনামুখ্য ও চিত্রধর্মী গদ্যের সম্পূর্ণ উপযোগী। তাই 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে দণ্ডকারণ্যের অরণ্য-সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন অপূর্ব দক্ষতায়—

> ''কোথাও স্নিগ্ধশ্যাম, কোথাও ভীষণরুক্ষ দৃশ্য, স্থানে স্থানে নিরন্তর নির্ঝর ঝরঝর মুখরিত; কোথাও তীর্থাশ্রম, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও নদী, কোথাও ঘন বন। ঐ যে জনস্থান পর্যন্ত দীর্ঘ দক্ষিণারণ্য চলিয়াছে। এই অরণ্যভূমি চিরদিন সর্ব্বলোকলোমহর্ষণ-এখানকার গিরিগহ্বর সকল উন্মত্ত প্রচন্ড শ্বাপদসংকুল। কোথাও একেবারে, নিষ্কুজস্তিমিত, কোথাও নিরন্তর গর্জ্জনধ্বনিত, কোথাও বা গভীর গর্জনকারী ভূজঙ্গগণের নিশ্বাসে জ্বালিত অগ্নি; কোথাও গর্ত্তমধ্যে অল্পজল দেখা যাইতেছে, এবং তৃষিত কৃকলাসেরা অজগরের স্বেদ বিন্দু পান করিতেছে।''[৩৯]

সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে গভীর সংযোগ না থাকলে ভাষার এমন শব্দ বিন্যাস ও বাঁধুনিকে যত্নের সঙ্গে ধরে রাখা যেত না। এমনকি তিনি মনের অনুভূতিকে শব্দের ব্যঞ্জনাগভীরতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সংস্কৃত সমাসবদ্ধ শব্দের পাশাপাশি বাংলা ভাষার প্রতিদিনের চেনাশব্দকে নতুনভাবে কাজে লাগিয়েছেন। লেখকের অন্তর্গূঢ় দৃষ্টি এবং শিল্পীর প্রয়োগভঙ্গিমায় নিরাবয়ব ভাব যেন সাবয়ব হয়ে উঠেছে।

লোকমুখে ব্যবহৃত একাধিক পদকে হাইফেন বসিয়ে সমাসবদ্ধ পদের মতো রূপদান করেছেন বলেন্দ্রনাথ। 'উত্তরচরিত' তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এ নাটকের অন্তরলোকে প্রবেশ করে তিনি লিখেছেন—

> ''সর্বাঙ্গ দিয়া এবং সকল হৃদয়দিয়া ভবভূতি প্রিয়জনকে অন্তরের অন্তরদেশে চাপিয়া ধরেন। সেকি জানি কি কে সম্যক অনুভব করিয়া উঠা যায় না; অঙ্গ অবশ হইয়া আসে, চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে, ভবভূতি আত্মহারা হইয়া যান, কিন্তু প্রিয়জন ততই কি-জানি-কি....।''[৪০]

সীতার স্পর্শে রামচন্দ্রের রোমান্টিক ব্যাকুলতার কথা বলতে গিয়ে 'কি-জানি-কি'র মতো রহস্যময় শব্দ ব্যবহার ছাড়া লেখকের অন্য কিছু উপায় ছিল বলে মনে হয় না। এমন শব্দ আমাদের প্রতিনিয়ত বক্তব্যে প্রকাশ পায়, কিন্তু সেখানে আমরা এর অন্তর্গূঢ় তাৎপর্যকে উপলব্ধি করার অবকাশ পাই না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই শব্দের ব্যবহার নিঃসন্দেহে বিশিষ্টতার দাবী রাখে। তা না হলে প্রাবন্ধিকের হাতে একবার নয় বহুবার এমনশব্দের স্ফূর্ত মুক্তি ঘটেছে। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদেও এই শব্দ ব্যবহার আশ্চর্যভাবে রহস্যঘন হয়ে উঠেছে—

> ''বাল্মীকি আশ্রমে কৌশল্যা-জনকাদি সমাগমেই কি, লব-চন্দ্রকেতুর সুবর্ণিত সৌজন্য পরিপূর্ণ যুদ্ধ দৃশ্যেই কি, এবং সপ্তম অঙ্কের নাট্যাভিনয়েই বা কি, সর্বত্রই যেন একটা কি ধরি-ধরি-ধরা-যায়-না, যেন কাহাকে জানি না, অথচ জানি, যেন অভিনয়, কি সত্য, ভ্রম, কি বাস্তব, ঠাহরাইয়া উঠা কঠিন।''[৪১]

এই 'কি-জানি-কি' বা 'ধরি-ধরি-ধরা-যায়-না'র মতো হাইফেন বসিয়ে নতুন রীতির সমাসবদ্ধ পদ রোমান্টিক বাংলা গদ্যসৃষ্টির প্রেরণাতেই তাঁর রচনায় এসেছে। এমন পদব্যবহারের রীতি যদিও আধুনিক পূর্ব-যুগের বাংলা কবিতায় দুর্লভ ছিলনা। রামবসুর গানের কলিতে 'প্রবাসে যখন যায় সে গো তারে বলি বলি বলা হলো না'....র মধ্যেও এমন রীতিটি সুস্পষ্ট। একারণেই প্রিয়নাথ সেন নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন—

> ''ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কিশোর প্রতিভা প্রায়ই পূর্বতন আচার্যদিগের পদানুসরণ করে। আমরা তাঁহার তরুণ কণ্ঠস্বরে পরিচিত পুরাতন স্বরভঙ্গী শুনিতে পাই— ভাষা গঠনে পরিচিত শব্দ বিন্যাস পদ্ধতি দেখিতে পাই— এবং ছন্দরচনায় পূর্বতন কবিদিগের শিল্পচাতুর্য অনুভব করি।''[৪২]

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনারীতি আলোচনায় বারবার যে বিষয়টি বিস্ময়ের উদ্রেক করে তাকে নিঃসন্দেহ হয়ে বলা যায় যে তিনি কাব্যভাষা শিল্পকেই তাঁর গদ্যরচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। ফলে যুক্তির পরিবর্তে, বলেন্দ্রনাথের ভাষায় হঠাৎ প্রকাশ পায় উপমার আলো। অথচ তাঁর এই উপমা কেবলমাত্র বাইরের অলংকার রূপেই গদ্যের

শোভা বর্ধন করেনি, গদ্যে প্রাণের সঞ্চার করেছে। ফলে তাঁর গদ্য বহুদিন বিস্মৃত এক একটি যুগের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'কণারক'এর কথা। এই রচনাটির আরম্ভ হয়েছে যে উপমায়; তার মধ্যে দিয়েই ঘটেছে প্রবন্ধের সমাপ্তি। বর্তমান কালের পরিত্যক্ত এই নির্জন জীর্ণ দেবালয়কে তিনি বলেছেন—

> ''কণারকে এখন কিছুই নাই, ধূ ধূ প্রান্তর মধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধি মন্দির— শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী।"[৪৩]

প্রবন্ধের শেষেও এই একই উপমা ফিরে এসেছে—

> ''কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত; যেন কোন প্রাচীন উপকথার বিস্মৃত প্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে— এবং অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখার ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিন্তাদৃশ্যের মত বোধ হয়।"[৪৪]

কণারকের মন্দিরের মতোই তাতে বলিষ্ঠ বিশালতার সঙ্গে কমনীয় সৌন্দর্যের অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে। বাস্তবিক 'বলেন্দ্রনাথের ভাষা কণারকের পরিত্যক্ত মন্দিরের মতই' প্রমথনাথ বিশীর এ মন্তব্যে তাঁর গদ্যের পূর্ণ সত্য স্বরূপটিই উদ্ভাসিত হয়েছে। একদিকে বিলাস অন্যদিকে বৈরাগ্য এ দু'য়ের সার্থক মিলন ঘটেছে। শুধু কণারকের মন্দিরের বৈরাগ্য ও বিলাস নয়; বলেন্দ্রনাথের ভাষাতেও এ হেন রূপের মিলন ঘটেছে সেখানেও নির্জনতাই প্রাণ পেয়েছে।

এমন অনেক উদাহরণ বলেন্দ্রনাথের রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। যেখানে রূপ-রস-গন্ধ, শব্দ-স্পর্শের একযোগে উপস্থিতি একাধিক অভিজ্ঞতা নিয়ে এক বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করেছে। মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের পার্থক্য ফুটিয়ে তুলতে বলেন্দ্রনাথ কালিদাসের 'রঘুবংশ' আর 'ঋতুসংহার'কে আশ্রয় করে উভয়ের পার্থক্য নিরুপন

করেছেন। একারণেই বলেন্দ্রনাথ ফুল, ভ্রমর, চাক ও আকাশের উপমা দিয়েছেন, যা বক্তব্যের সঙ্গে অন্বিত হয়ে গেছে—

> ''ঋতুসংহারে কালিদাস মধুপের মত ছয় ঋতুর অন্তরে বসিয়া কেবলি আদিরসে মধুপান করিয়াছেন। বাহিরের জনকোলাহল, জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখ তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। জগৎ তিনি যতটুকু দেখিয়াছেন এই ফুলের উপর বসিয়াই। আর মহাকাব্যের বর্ণনা স্বতন্ত্র। ভ্রমর চাক ছাড়িয়া আকাশে বাহির হইয়াছে। নিম্নে ধরণীর যৌবন বিস্তার, জনকোলাহল, জন্মমৃত্যু। দূর হইতে ভ্রমর এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যে গান গাহে, তাহাতেই মহাকাব্য রচিত হয়।''[৪৫]

এমন উপমা সত্যই অপূর্ব। ভ্রমর যেমন ঠিক তেমনিভাবেই কবিমন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, অন্তর থেকে বাইরে বেরিয়েছে। সুবিস্তৃত নীলাকাশের নীচে দাঁড়িয়ে ঋতুসংহারের বদলে রঘুবংশ রচনা করেছেন।

যশোদার নারীরূপকে ফুটিয়ে তুলতে, উমার সাথে তাঁর তুলনা অনুভব করে তা ব্যক্ত করেছেন 'যশোদা' প্রবন্ধে। যশোদাকে প্রাবন্ধিক বলেছেন বৈষ্ণব হৃদয়ের কোমলাঙ্গিনী সৃষ্টি, যেখানে শিবের সহধর্ম্মিনী পার্বতীর মতো তেজস্বিতা নেই। তাই তিনি বলেন—

> ''যশোদা গোপবধূ, গোপগৃহিনী-ত্রিশূলও নাই, নন্দী ও নাই, ভৃঙ্গীও নাই, নাই সুরাসুর সম্পর্ক, নাই কোনও গণ্ডগোল— আভীর পল্লীর শ্যামল সৌন্দর্য্যে কৃষ্ণের মুখখানি দেখিয়া পরিতৃপ্ত।''[৪৬]

আবার কোথাও বা দুই জননীর স্নেহের অন্তর্গত রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন এইভাবে—

> ''উমার সহিত যশোদার স্নেহ তুলনা করিলে বোধ হয়, উমায় ঊষার কনকভাবের আভাস পাওয়া যায়। যশোদার মত তাঁহার স্নেহে সর্ব্বদাই হারাই হারাই ভয় প্রবল নহে।''[৪৭]

তবু মাতৃস্নেহে বিগলিত দুই হৃদয়ের কোনটিকেই কবি কারোর অপেক্ষা হীন বলে মনে

করেননি। শুধু দুইজনের স্নেহ প্রকৃতির বিভিন্নতা প্রকাশ করেছেন এইভাবে—

''স্নেহ স্নেহই। প্রভেদ কেবল অবস্থা এবং চরিত্রগত বিশেষত্ব লইয়া''[৪৮]

'বোলতা ও মধ্যাহ্ন' প্রবন্ধ লেখকের একটি সুন্দর ব্যক্তিগত রচনা। মধ্যাহ্নের ভাবরূপ আঁকতে গিয়ে প্রাচীন কবি কালিদাসের মধ্যাহ্ন ভাবনার অনুভূতির ছায়া পড়েছে বলেন্দ্র মনে। যেখানে কামনার দাবদাহে দগ্ধ হয়ে শকুন্তলা নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে ছায়াস্নিগ্ধ শান্তির মধ্যে; শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের মিলনে। এ নাটকে দুষ্মন্ত যেন খররৌদ্রলোকিত মধ্যাহ্ন; আর শকুন্তলা তরুচ্ছায়াসম্মিলিত শান্তি। তাই লেখক বলেন্দ্রনাথ বলতে পারেন—

''.....প্রখর মধ্যাহ্নে মালিনী নদীতীরে কম্পিত তরুতলে শকুন্তলা।
শকুন্তলা ছায়া। বৃক্ষান্তরাল হইতে মুগ্ধ দুষ্মন্ত উঁকি মারিতেছেন।
দুষ্মন্ত প্রখরতেজ মধ্যাহ্ন। মধ্যাহ্ন ছায়ায় প্রেমে মুগ্ধ।''[৪৯]

আর নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধর তো বলেই গেছেন—

''সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ।
প্রচ্ছায় সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ।।''[৫০]

কখনও বা বলেন্দ্র প্রতিভা আমাদের অতি পরিচিত জগতের থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে প্রকৃতির রূপাবয়বকে রমনীয় আকার দিয়েছেন। 'ঊষা ও সন্ধ্যা' প্রবন্ধটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে লেখক 'ঊষা ও সন্ধ্যা'র মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য ফুটিয়ে তুলেছেন। যেখানে মুহূর্তে একটা অজানা রঙ ও রূপ আমাদের দৃষ্টিতে ভীষণ চেনা হয়ে ধরা পড়ে। তাই এই দুই বস্তুর মিলনে লেখক-হৃদয় মুগ্ধ হয় এবং মানব জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাব অনুভবকে এদের সঙ্গে একীভূত করেন। কারণ—

''.....ঊষা প্রত্যহ আমার বিছানার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়— তাহার
কচি কচি হাত দু'খানি দিয়া আমাকে ঠেলিয়া উঠাইয়া দেয়।''[৫১]

আর—

''সন্ধ্যা যেন কতকটা আমাদিগের সুখদুঃখের কথা বুঝে, সন্ধ্যার
সঙ্গে আমরা কত কি সাংসারিক কথাবার্তা কই। জীবনটার কথা
সন্ধ্যার সময় মনে পড়িয়া যায়।''[৫২]

তাই লেখকের অনুভূতিতে—

> ''সন্ধ্যা গোলাপফুল— তাহার হাসিখানি গোলাপের মত; ঊষা শিউলী ফুল— তাহার হাসিটি শিউলির মত।''[৫৩]

কি শব্দ চয়নে, কি অলংকার, উপমা পরিবেশনায়, কি ভাবের গভীরতায় বলেন্দ্র প্রতিভা স্থান থেকে স্থানান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে নিত্য ভ্রমণশীল। এই কারণে প্রিয়নাথ সেন একজায়গায় বলেছেন—

> ''শব্দ চয়নে বলেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা, এক একটি কথা এক একটি চিত্র—এমন পূর্ণ প্রাণ পূর্ণ-অবয়ব কথা বাংলা গদ্যে কোথাও দেখি নাই।''[৫৪]

এইভাবে বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের অমরাপুরীর সন্ধান দিয়েছেন। তবু বলেন্দ্রনাথের ভাষা রীতির ত্রুটি নির্দেশ করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী লিখেছিলেন—

> ''.....সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে দেশী ও অন্যান্য ভিন্ন শ্রেণীর শব্দের যোগাযোগে যে শ্রেষ্ঠ গদ্যরীতি গড়ে ওঠে সেই রহস্যটি আয়ও করবার সুযোগ তিনি পাননি।''[৫৫]

অথচ এ ধরনের যোগাযোগ সাধনে কৌতুককর চেষ্টা চালিয়েছেন প্রাবন্ধিক।

সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনায় বলেন্দ্রনাথের রচনারীতি মননশীল এবং গুরুগম্ভীর, সুনির্বাচিত প্রত্যেকটি শব্দ এবং ধ্বনি গাম্ভীর্যকে তিনি সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। এরই পাশাপাশি বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় স্থির মন ও মেজাজ নিয়ে নিতান্ত ঘরোয়া ও আটপৌরে ভঙ্গীতে আলাপ করেছেন, যেখানে লেখকের কণ্ঠস্বরে বৈঠকী মেজাজটি চাপা থাকেনি। এ যেন তাঁর রচনারীতির আরেক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে। এই ধরনের আলোচনায় কখনও রঙ্গ-রসিকতা, কখনও বা সুস্মিত হাস্যরস, আবার কখনও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ স্নিগ্ধ কৌতুকের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'ভারতচন্দ্র রায়', 'রাধা' কিংবা 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য' ও 'ইংরাজি বনাম বাঙ্গলা' প্রবন্ধগুলি স্মরণযোগ্য। গ্রামীণ রসিকতার আমেজটি ফুটিয়ে তুলেছেন ঘরোয়া ভঙ্গীতে—

''শিবের রকম দেখিয়া স্ত্রীগণ সকলেই অবাক। এমনতর বাঘছালপরা ক্ষেপাবর ত কেহ কখনও দেখে নাই। নারদ ইহাকে কোথায় পাইলেন? সুন্দরবন হইতে ধরিয়া আনেন নাই ত? এমন কথাও মুখে আনে—রাম বল।''[৫৬]

কখনো বলেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে সুস্মিত হাস্যরস পরিবেশন করেছেন—

''.....তবে ভিন্নরুচিও ত সংসারে আছে। আমাদের অন্তঃপুরচারিণীগণ কিরূপ সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী বলা যায় না। বাঙ্গালা দেশেই ত বীর সেনাপতি কার্ত্তিকেয় সৌখিন বাবু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।''[৫৭]

আবার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে 'প্রাচীনবঙ্গ সাহিত্য' প্রবন্ধটিতে—

''.....সমাজের অবস্থা এত হীন হইয়া পড়িয়াছিল যে, অশ্লীলতা বই আর কিছুতেই মন উঠিত না— ভাল জিনিসকে মন্দ করিয়া না লইলে তাহাতে আমোদ উপভোগ হয় না, দেবতাকে বানর করিয়া না গড়িলে মন প্রবোধ মানে না। শিবের প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ইদানীং লক্ষ্মীছাড়া গঞ্জিকা সেবকের অস্থিপঞ্জর ইহয়া উঠিয়াছে— কৈলাসধাম হইয়াছে গঞ্জিকা প্রধান আড্ডা, রাজনীতি বিশারদ অদ্বিতীয় রণপন্ডিত শ্রীকৃষ্ণ ছলনাপটু বংশীধর রমনীমোহনে পরিণত হইয়াছেন; মহত্ত্ব গাম্ভীর্য্য সুবিধামত ছিব্‌লামিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।''[৫৮]

এরই পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত গুরুগম্ভীর বিষয় কেন্দ্রিক প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘটেছে কৌতুকোজ্জ্বল স্নিগ্ধতার আড়ালে—

''....। এবং বিবাহের পূর্ব্বে বাঙ্গলা বই কিনিয়া পয়সা নষ্ট করিতে রাজি না হইলেও গৃহিণীর শুভাগমন হইতে অনেক ইংরাজিনবীশের বাঙ্গলা গ্রন্থের সহিত পরিচয়ও সাধিত হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের ভরসাও সেইখানে। বঙ্গসাহিত্য আমাদের

অন্তঃপুরেই প্রতিদিন জীবনে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়া নিঃশব্দে
দেশের সর্ব্বত্র তাহার অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিতেছে।"[৫৯]

এই সকল দৃষ্টান্ত আলোচনার পর স্বভাবতই আমাদের মনে হয় সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের যত আত্মীয়তাই থাকুক, রঙ্গব্যঙ্গ এবং পরিহাস পরিবেশনায় রয়েছে তাঁর সহজাত উত্তরাধিকার। এই অন্তরতম অন্তর সুন্দরতার আকাঙ্ক্ষাই বলেন্দ্র ব্যক্তিত্বকে শিল্পিত্বে উন্নীত করেছে। তিনি যে কারুকার্যমন্ডিত, শ্রমসাধ্য প্রবন্ধ সৃষ্টি করেছিলেন তার অন্তর্গত সৌন্দর্য আস্বাদন করতে গেলে আধুনিক জীবনের জটিলতা ও কর্মব্যস্ততাকে ভুলতে হবে। যদিও এ শতাব্দীর সাহিত্যিকেরা রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার আতিশয্য বর্জন কাম্য বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর রচনা হয়তবা এ যুগের পাঠকের কাছে অহেতুক অলংকরণ বলে মনে হতে পারে। তথাপি বিচিত্রভাবের গভীরতায় ও সৃষ্টির নবতর প্রয়াসে বলেন্দ্রনাথ কর্মে ও সৃষ্টিতে আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর সাহিত্য আলোচনার প্রত্যেকটি স্তরে মনোনিবেশ করলে ধরণীর উপভোগ বিভোর শিল্পীসত্তাটিই আমাদের চোখে প্রতিভাত হবে।

তথ্যসূত্র

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, 'সাহিত্যের সামগ্রী', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ. ১৮

২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, 'সাহিত্যের বিচারক', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৪১৭; পৃ. ২৬

৩। আচার্য বামন, 'কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ', ড. অনিশচন্দ্র বসু (সম্পা.), সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ২০০৭, পৃ. ৬৩

৪। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, কাহিনী, 'ভাষা ও ছন্দ', রবীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ১০১

৫। সেন প্রিয়নাথ, 'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর', বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা), কলিকাতা ১৯৭২, পৃ. ৭

৬। রায় অপূর্বকুমার, 'প্রস্তাবনা', শৈলীবিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা ১৯৮৯, পৃ. ১৫

৭। তদেব, পৃ. ১৫

৮। ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার, কলিকাতা ১৯৮৯, পৃ. ১

৯। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'শিবসুন্দর', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৫৮৭

১০। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'প্রার্থনা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৫৮৯

১১। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'বোলতা ও মধ্যাহ্ন', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৩৭১

১২। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'জন্মভূমি', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ১৪৩

১৩। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'প্রার্থনা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৫৮৯

১৪। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'বোলতা ও মধ্যাহ্ন', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৩৭১
১৫। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'অতীত', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ১৪১
১৬। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'জন্মভূমি', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ১৪৩
১৭। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'প্রার্থনা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৫৮৮
১৮। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'ঋতুসংহার', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৩৯৬
১৯। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'শুভ উৎসব', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৫৬৪
২০। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'ইংরাজি বনাম বাঙ্গলা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৪৯১
২১। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'প্রাচীন উড়িষ্যা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৫২৩
২২। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'গৃহকোণ', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৫৭৫
২৩। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'বোম্বায়ের রাজপথ', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৫৩৪
২৪। স্বামী বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র (১), 'পোশাক ও ফ্যাশন', সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ (সম্পা.), কামিনী প্রকাশনা, কলিকাতা ১৯৯৪, পৃ. ১৩
২৫। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'কাব্যে প্রকৃতি', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৫৩
২৬। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'প্রার্থনা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৫৮৮

২৭। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'যাত্রা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ১০৪
২৮। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'কাহিনী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ১০৮
২৯। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'কণারক', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৫১৭
৩০। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'শরৎ ও বসন্ত', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৩৫৩
৩১। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'কণারক', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৫১৯
৩২। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'শরৎ ও বসন্ত', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৩৫৬
৩৩। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'দু'জনায়', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ১২৮
৩৪। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'শুভ উৎসব', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৫৬৫
৩৫। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'কবি ও সেন্টিমেন্টাল', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৩৮৭
৩৬। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'প্রেম : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ২৯৩
৩৭। চৌধুরী ভূদেব, বাংলা গদ্যে বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ; বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা.), কলিকাতা ১৯৮৯, পৃ. ৭৯
৩৮। সেন প্রিয়নাথ, স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা), কলিকাতা ১৯৭২, পৃ. ১০
৩৯। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'উত্তরচরিত', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও

সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ২১
৪০। তদেব, পৃ. ১৬
৪১। তদেব, পৃ. ২৪
৪২। সেন প্রিয়নাথ, স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা), কলিকাতা ১৯৭২, পৃ. ৭
৪৩। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'কণারক', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৫১৭
৪৪। তদেব, পৃ. ৫২০
৪৫। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'ঋতুসংহার', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৩৯৬
৪৬। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'যশোদা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৩৪৩
৪৭। তদেব, পৃ. ৩৪৭
৪৮। তদেব, পৃ. ৩৪৭
৪৯। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'বোলতা ও মধ্যাহ্ন', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৩৭৩
৫০। কালিদাস, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পা), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা ১৯৯৮, পৃ. ২২
৫১। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'উষা ও সন্ধ্যা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ১০২
৫২। তদেব, পৃ. ১০২
৫৩। তদেব, পৃ. ১০৩
৫৪। সেন প্রিয়নাথ, স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা), কলিকাতা ১৯৭২, পৃ. ১০
৫৫। চৌধুরী ভূদেব, বাংলা গদ্যে বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ; বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা.), কলিকাতা ১৯৮৯, পৃ.
৫৬। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'ভারতচন্দ্র রায়', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ২৭৪

৫৭। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'রাধা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৩১৯

৫৮। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ১৭০

৫৯। ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, 'ইংরাজি বনাম বাঙ্গলা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৭২, পৃ. ৪৯৪

উপসংহার

উপসংহার

উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের বাঁক ফিরেছিল বিষয় থেকে বিষয়ীর দিকে। এই সময় গদ্য সাহিত্যের আকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি ঘটেছে। ১৮৭২ খ্রীঃ বাংলা সাহিত্য জগতে একটি বিশিষ্ট বৎসর হিসাবে পরিগণিত হয়। এই বছরেই বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ও নির্দেশনায় বাংলা গদ্য সাহিত্য তখন যৌবন প্রাপ্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন—

> ''কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।''[১]

বাংলা গদ্য সাহিত্যের এই যজ্ঞে বলেন্দ্রনাথও আত্মনিবেদন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তরুণ রবীন্দ্রনাথের একলব্য শিষ্য, সাহিত্যচর্চার সঙ্গী, জমিদার পরিভ্রমণে সহযাত্রী এবং কবির জোড়াসাঁকো-শিলাইদহ জীবনে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অনুজ পরিকর। সাহিত্য চর্চায় পিতৃব্যের শিষ্য হলেও বালক বয়স থেকেই তাঁর সাহিত্যরচনায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিভাসিত হয়েছিল। পিতামহ দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম আরব্ধ কাজ সম্পাদনা করার উদ্দেশ্যে বলেন্দ্রনাথই শান্তিনিকেতন সাধনাশ্রমের ট্রাস্টডিড অনুসারে ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপনে তৎপর হয়েছিলেন। আঠারোশো নিরানব্বইতে শান্তিনিকেতন প্রাক্‌কুটিরে ব্রহ্মবিদ্যালয় উদ্বোধনের চার মাস আগেই বলেন্দ্রনাথ মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে অকাল প্রয়াত হন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতেই ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সেই সলতে পাকানোর সম্পূর্ণ ইতিহাস পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। বলেন্দ্র প্রতিভা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ছিল। তাঁর প্রতিভা অসমাপ্ত, পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই তা অস্তমিত হয়েছে। তবু বলেন্দ্রনাথকে অরচিত বাংলা স্টাইলিস্ট গদ্যের মহানায়ক বলতে দ্বিধা নেই। এ প্রসঙ্গেই আরও কয়েকজন বাঙালি সাহিত্যিকের কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে। প্রতিভার তাৎক্ষণিক বিচারে এবং অকালমৃত্যুর সাদৃশ্যে এখানে উপস্থিত করা যায় সতীশচন্দ্র রায়, অজিকুমার চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখকে। কারণ—

> ''ইহাদের রচনা পাঠককে যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়ে তাহার মনে আগ্রহ জাগাইয়া দেয়। যাহা হইয়াছে তাহারই পটে যাহা হইতে পারিত পাঠকের চিত্তকে আন্দোলিত করিতে থাকে। এরকমক্ষেত্রে ইহাদের রচনার সমালোচনা অনেক পরিমাণে সম্ভাবনার ইতিহাস হইতে বাধ্য।''[২]

সমালোচকের এই নিরাভরণ মূল্যায়নটি যথার্থ।

প্রথম অধ্যায়ে বলেন্দ্র-জীবনীর কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সূত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি যে বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তি চিন্তা, ব্যক্তিজীবনে তাঁর সৌন্দর্যবোধ, পারিবারিক ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তিনির্ভর মতামত, ব্যক্তিজীবনে তাঁর বিশ্বাসবোধ, সংস্কৃতের প্রতি তাঁর আগ্রহ, প্রপিতামহ দ্বারকানাথের ব্যবসা-বাণিজ্যের বহুমুখী উদ্যম, পিতামহ দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা, পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ব্রতর দ্বারা তিনি কিভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এছাড়াও সাহিত্যিক পরিচয়টুকু বাদ দিয়েও বলেন্দ্রনাথের একাধিক কর্মপ্রচেষ্টা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। বলেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণপাণির প্রসন্ন আশীর্বাদ বলেন্দ্রনাথকে সম্পদশালী করে তুলেছিল। বস্তুতঃ নিভৃত প্রকৃতিতে জীবন অভিজ্ঞতা এবং অনুভবের সাধর্মে তিনি ছিলেন রবীন্দ্র-অনুগামী। কিন্তু মনের মূলগত স্বভাব ও অধ্যয়ন অভিজ্ঞতায় দু'জনেই পরস্পরের থেকে পৃথক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মনে বিশ্বগ্রাহী চেতনা বর্তমান ছিল। অন্যদিকে বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব 'সংবৃততর গৃহবলিভুক'।[৩] পারিবারিক উৎসবে ও পারিবারিক সখ্যে বলেন্দ্রনাথ ছিলেন সদা তৎপর। রবীন্দ্রনাথ যেমন গৃহ পরিবেশ ছাড়িয়ে নিজস্ব পরিবেশ রচনা করেছিলেন, গৃহকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে তাঁর নিরুৎসাহ তাঁর নানা চিঠিপত্রে লক্ষ্য করা যায়। এক আশ্চর্য নির্লিপ্তিতে তিনি শোককে সহনীয় করে তুলতে পারতেন। বিপরীত দিকে মহর্ষি পরিবারের সম্পৃক্তি ছিল বলেন্দ্রনাথের কাছে গৌরবের। মহারাণি পরিবারের সঙ্গে মহর্ষি পরিবারের তুলনা তাঁর কাছে ছিল আনন্দকর কৌতুক। তাই বিশ্ববিস্তারের আকাঙ্ক্ষা তাঁর নিভৃত পরিবেশের মধ্যেই প্রকাশ পেত। এই স্বাতন্ত্র্যের কারণেই বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রানুসারি হলেও একান্ত অনুগত অনুকারী নন। বলেন্দ্রনাথের রচনায় নিজস্ব শৈলীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা কখনোই বশীভূত নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বাংলা সাহিত্যে সৌন্দর্য অনুসন্ধানের ইতিবৃত্তটি আলোচিত হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্যবোধ যেমন এসেছে তেমনি রবীন্দ্রনাথ, প্রমথচৌধুরীও এই আলোচনায় উঠে এসেছেন। পাশ্চাত্যের কীটস্ প্রমুখ অনেকের সঙ্গেই বলেন্দ্রনাথের সংযোগসূত্র যে কতখানি গভীর তা উঠে এসেছে এই অধ্যায়ে। সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য প্রসঙ্গও বলেন্দ্রনাথের রচনায় বারবার উঠে এসেছে তাও এখানে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক বলেন্দ্রনাথ যে আলোচনা করেছিলেন তা তুলে ধরেছি। বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি কালিদাসের প্রতি যে কতখানি অনুরক্ত ছিলেন তা এই অধ্যায়ে উঠে এসেছে। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন্দ্রনাথের পূর্বসুরী বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথচৌধুরীর প্রসঙ্গও উত্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে, রোমান্টিক বলেন্দ্রনাথ আবার সৌন্দর্যপিয়াসী। বলেন্দ্রনাথ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনেও বহু বিচিত্র ইতিহাস নিষ্ঠার যে পরিচয় রেখেছেন তা আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। ইতিহাসের তথ্যস্তূপের ভেতরে জাতির প্রাণস্পন্দন, প্রেম ও সৌন্দর্যের যুগ্মবিহার, গৌরবান্বিত অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাস, অতীতচারিতার মধ্যে যে রোমান্টিক বেদনাবোধ, মন্দিরময় ভারতে যে সাংস্কৃতিক শক্তি তা বলেন্দ্রনাথের ক্ষণকালীন জীবনে কিভাবে চিরকালীন মন্ত্রশক্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে সেটাই দেখানো হয়েছে এই অধ্যায়ে। পাঞ্জাবের সাথে বাগ্‌দাদের স্থানিক দূরত্ব বলেন্দ্রনাথের লেখায় হারিয়ে যায়, ইসলামী গম্বুজ মিনার আর হিন্দুর দেবদেবীর চিত্র একাকার হয়ে যায়। সংস্কৃতি চর্চায় বা ভারতীয় সংস্কৃতিচর্চায় 'শুভউৎসব' এর মত প্রবন্ধ যে দ্বিতীয়টি লেখা হয়নি সেকথা যেকোন গবেষকেরই প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব আছে এবং আমি তার প্রচেষ্টা চালিয়েছি এই অধ্যায়ে।

বাংলা সাহিত্যচর্চায় বলেন্দ্রনাথ যে কতখানি আসন জুড়ে রয়েছেন তারই অনুসন্ধান করেছি পঞ্চম অধ্যায়ে। বলেন্দ্রনাথ যে শুধুমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যের জগতেই বিচরণ করেছেন তা নয়, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনাচিন্তা একালে অনেকেই মনে রাখেন

না। কিন্তু তিনি যে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে, শাক্ত সাহিত্য সম্পর্কে, অনুবাদ সাহিত্য সম্পর্কে কতখানি অনুরাগ পোষণ করতেন তা তুলে ধরেছি এই অধ্যায়ে। সংস্কৃত সাহিত্যের চেয়ে বলেন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিও সূক্ষ্ম রসবোধে যে উদ্ভাসিত তা আলোচনায় উঠে এসেছে এই অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাশ্চাত্যের 'পার্সোন্যাল এসে' বাংলায় নৈব্যক্তিক রচনা অর্থাৎ রম্যরচনা শাখাটিতেও তিনি যে ফুল ফুটিয়েছেন তা আলোচিত হয়েছে। 'বালক' পত্রিকাতে প্রকাশিত রম্যরচনাগুলির চারটিই যে এক ভ্রামণিকের চোখে দেখা দৃশ্য বিবরণ তা আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। 'ব্যক্তিগত' রচনাগুলিতে বেদনার আভা ফুটে উঠেছে। উন্মাদ পিতার পুত্র হিসাবে ঠাকুর বাড়ির বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যেও বলেন্দ্রনাথ ছিলেন নিঃসঙ্গ। স্বভাবতই তাঁর অন্তর ছিল বিষণ্ণ ও ব্যথিত আর এই কারণেই তাঁর রচনাতেও এসেছে বিষণ্ণতা। বলেন্দ্রনাথের তাই ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলি এত মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

সপ্তম অধ্যায়ে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ শৈলীর নানাদিক আলোচিত হয়েছে। বলেন্দ্রনাথের রচনার বিষয়বস্তুতে যেমন মৌলিকত্ব পরিস্ফূট হয়েছে তেমনি তাঁর ভাষায় যে একটা অনন্য সাধারণ শক্তি ছিল একথাও অস্বীকার করা যায় না। তাঁর রচনার ভাব যেমন নতুন তেমনি ভাষাও নতুন। তাঁর ভাষা অনুভূতি প্রকাশের ভাষা। তাঁর ভাষারীতি বিশ্লেষণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে বলেন্দ্রনাথ ভাষারীতির ক্ষেত্রে ইংরাজি, বাংলা ও সংস্কৃতরীতির অনুসরণ করেছিলেন। সমকালীন অন্যান্য লেখকদের মতো তিনি বাক্যসজ্জা, শব্দ চয়ন কিংবা অলংকার প্রয়োগে ইংরাজি নীতি অনুসরণ করেছিলেন—এখানেই তাঁর শিল্প নৈপুন্যের পরিচয়।

সামগ্রিকভাবে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি পূর্বাপর আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি কোনো কোনো রচনায় ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণত ফুটিয়ে তোলার অবকাশ ছিলনা। বিশেষত বালক বয়সের রচনাগুলিতে এই বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়ে। এখানে ভাষার বাঁধুনি পরিপূর্ণভাবে তাঁর আয়ত্তাধীন নয়। পরবর্তীকালে যখন তিনি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও ললিতকলার সমালোচনায় অগ্রসর হয়েছেন সেখানে তিনি অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন। সেক্ষেত্রে সর্বপ্রথম একটি বিশিষ্ট স্টাইল বা রীতি চোখে পড়ে রচয়িতার ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট।

এমনকি হৃদয়ের উদারতা যেন খানিকটা ধরা পড়েছে অনায়াসেই। যুক্তিনিষ্ঠা অপেক্ষা ভাবাবেগ এক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে। বলেন্দ্রনাথের রচনায় বহুলতা না থাকলেও বৈচিত্র্য ছিল। ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন এবং বিপরীতমুখী প্রসারের প্রবণতা তাঁর সাহিত্যকর্মের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অতীত ও বর্তমান, কল্পনাবিলাস ও বাস্তবতা, মন্ময়তা ও তন্ময়তায় বিপরীত ধর্মী প্রবণতা বলেন্দ্ররচনায় বিষয় নির্বাচনে প্রকট। তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধাবলীর বিষয় বহু বিচিত্র। কোথাও তিনি প্রাচীন ভারতীয় কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন ('মেঘদূত', 'উত্তরচরিত'), কোথাও প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি, চিত্র-ভাস্কর্য সম্পর্কিত আলোচনায় নিবিষ্ট হয়েছেন ('শুভউৎসব', 'কণারক'), কোথাও আবার আত্মগত ভাবনা-কামনার মোহজালে আপনাকে বিসর্জন দিয়েছেন (অতীত, অশ্রুজল), কোথাও নিছক চিত্রসৃষ্টির নেশায় তিনি মেতে উঠেছেন (একরাত্রি, লাহোরের বর্ণনা)। ব্যক্তিগত রচনার আত্মোমোচনের সূত্রে বলেন্দ্রনাথের রচনার একটি বিশেষ দিক তাঁর বেদনার আভা। উন্মাদ পিতার পুত্র হিসাবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বাইরের বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই তাঁর মন ছিল বিষণ্ণ ও ব্যথিত— যার প্রভাব পড়েছে তাঁর রচনাতে। তাই সংস্কৃত সাহিত্যের নিষ্ঠাবান ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংস্কৃত আলংকারিকদের বিরুদ্ধে জীবন ট্রাজেডি বুঝতে না পারার অভিযোগ করেছেন। আর এর মূলেও রয়েছে তাঁর ব্যক্তিজীবনের ট্রাজেডি। ফলে তাঁর প্রবন্ধগুলি হয়ে উঠেছে হৃদয়গ্রাহী। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আনুগত্য, প্রগাঢ় সৌন্দর্যবোধ, বিদেশী শিক্ষামোহমুক্ত স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বলেন্দ্রনাথের দুর্লভ গুণাবলীকেই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান করেছে। বিষয় বৈচিত্র্যে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভাঁড়ারে অক্ষয় সম্পদরূপে চিরদিন রক্ষিত হবে।

> "কবি তাঁহার কল্পনা-উৎসের যত করুণাবারি সমস্তই কেবল জনক তনয়ার পুণ্য অভিষেকে নিঃশেষ করিয়াছেন। কিন্তু আর একটি যে ম্লানমুখী ঐহিকের সর্বসুখ বঞ্চিতা রাজবধূ সীতাদেবীর ছায়াতলে অবগুণ্ঠিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কবিকমণ্ডলু হইতে একবিন্দু অভিষেকবারিও কেন তাঁহার চিরদুঃখাভিতপ্ত নম্রললাটে সিঞ্চিত হইল না?"[৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'প্রাচীনসাহিত্য' গ্রন্থের 'কাব্যের উপেক্ষিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে যাঁর সম্পর্কে এই দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি হলেন রামায়ণ কাব্যের রামানুজ লক্ষ্মণের পত্নী ঊর্মিলা। কেবল ঊর্মিলাই নয় একইভাবে রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলার দুই সহচরী প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়া এবং 'কাদম্বরী' কাহিনীর পত্রলেখার জন্যও খেদ প্রকাশ করেছেন। কাব্যকাহিনীতে কবির লেখনীতে এই সকল চরিত্র উপেক্ষিতা হলেও দেখার মত চোখ, বোঝার মত মন, অনুভব করার মত অনুভূতি এবং বিচার করার মত সূক্ষ্মবোধ সম্পন্ন পাঠকের হৃদয়ে কিন্তু এই চরিত্রগুলি ঠিক তাঁদের স্থান করে নিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে আমাদের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারাতেও আমরা সীতা, শকুন্তলা কিংবা কাদম্বরীদের মত প্রথমসারির প্রাবন্ধিকদের নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকি যে ঊর্মিলা, প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া পত্রলেখাদের মত দুর্ভাগ্যবশত ফোকাসে না আসা প্রাবন্ধিকদের নিয়ে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিনা। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে ঊর্মিলা, প্রিয়ম্বদা, অনুসূয়া কিংবা পত্রলেখার অবদান নিয়ে একএকটি স্বতন্ত্র কাব্য রচনাও কিছু অসম্ভব ছিল না। তবুও দুর্ভাগ্যবশত রচয়িতার কলমের ফোকাস তাদের উপর পড়েনি। ফোকাসে আসা ভাগ্যের হাতে থাকে বলেই তাতে কোনো চরিত্রের যেমন গুরুত্ব হ্রাস বৃদ্ধি হয়না ঠিক তেমনি কোনো সাহিত্যিকেরও হয় না। সমুদ্রে উত্থিত বৃহৎ তরঙ্গের পিছনে আসা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তরঙ্গটিকে দেখতে হবে তবেই তো সমুদ্রের সামগ্রিক সৌন্দর্যটি ধরা পড়বে। একইভাবে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের রস উপভোগ করতে হলে কেবল প্রথমসারির লেখকদের পড়লেই চলবে না। আমার আলোচ্য প্রাবন্ধিক দুর্ভাগ্যবশত বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম প্রথমসারির ছায়াতলে লিখিত, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের এই 'ক্ষণিকের অতিথি' সাহিত্য জগতে উপেক্ষিত হয়ে থেকেও তিনি স্বতন্ত্র এক অধ্যায়— সংক্ষিপ্ত কিন্তু দীপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্যের উপেক্ষিতাদের জন্য বলে গেছেন—

> ''কাব্য সংসারে এমন দুটি-একটি রমণী আছে যাহারা কবিকর্তৃক সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াও অমরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। পক্ষপাতকৃপন কাব্য তাহাদের জন্য স্থানসংকোচন করিয়াছে বলিয়াই পাঠকের হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আসন দান করে।''[৬]

একইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুসরণ করে প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলা যায় যে, সাহিত্য সংসারে (জগতে) এমন দু-একটি প্রতিভা আছে যাঁহারা অধিকাংশ পাঠক কর্তৃক প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াও সৃষ্টি প্রতিভার অমরলোক হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। পক্ষপাতকৃপণ পাঠক সমাজ তাঁহাদের জন্য স্থান সংকোচন করিয়াছে বলিয়াই অনুসন্ধানী পাঠকের হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আসনদান করে। বলেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই মন্তব্যটি যথার্থ তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

বলেন্দ্রনাথের মত প্রাবন্ধিকের ভাষার যে ঔদার্য তা এখন দুর্লভ। তৎসত্ত্বেও ভাষার রাজকীয় ঐশ্বর্য উপভোগ করার মতো লোকের অভাব হবেনা। তবে সমাপ্তিতে এসে শুধু এ প্রশ্নই বারবার আমাকে ভাবিয়ে তোলে যে আরো কিছুদিন তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তবে কি নতুন কোন সম্পদের সৃষ্টি করতে পারতেন? বলেন্দ্রনাথ সর্বদাই গদ্যকে অনুর্বর জমি বা আগাছা বলে মনে করতেন না বলেই এই গদ্যেই তিনি স্বর্ণকান্তি ফসল ফলিয়েছিলেন। নিজের অন্তরের মধ্যে বিশ্বকে অনুভব করেছিলেন, বিশ্বের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেন নি বলেই তিনি সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির মধ্যে কবিতা, ব্যক্তিগত রচনা, প্রবন্ধকে বেছে নিয়েছিলেন। ক্ষণকালীন জীবনে প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন বলেন্দ্রনাথ, সঙ্গে যোগ হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। আর তাতেই বিস্ফোরণ ঘটে গেছে তাঁর সৃষ্টিতে। তুলনায় প্রতিতুলনায় হয়তো অনেক প্রাবন্ধিকের সাথে 'তর', 'তম' পার্থক্য ঘটেছে তবুও স্বল্পকালীন জীবনে অসাধারণ প্রবন্ধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বলেন্দ্রনাথ একক।

তথ্যসূত্র

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক সাহিত্য, 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৪০৯, পৃ. ৫০১

২। বর্মণ রমেন্দ্র, 'বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় বলেন্দ্রনাথ', বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা.), কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ১৩৮

৩। বিশী প্রমথনাথ, 'শতবর্ষ পরে বলেন্দ্রনাথ', বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা.), কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৪৮

৪। চৌধুরী ভূদেব, 'বাংলা গদ্যে বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ', বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, দেবদাস জোয়ারদার (সম্পা.), কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৬৪

৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য, 'কাব্যে উপেক্ষিতা', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, কার্তিক, ১৪০৭, পৃ. ৭২

৬। তদেব, পৃ. ৭২

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১) ঠাকুর বলেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৭২।

সহায়ক গ্রন্থ

১। গুপ্ত অতুলচন্দ্র, 'কাব্য জিজ্ঞাসা', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৩৮০

২। চক্রবর্তী সত্যনারায়ণ (সম্পা.), 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, ২৩শে জুলাই ১৯৯৯।

৩। চক্রবর্তী সুবোধ (সম্পা.), 'বঙ্কিম রচনাবলী', কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯১

৪। চট্টোপাধ্যায় হীরেন, 'সাহিত্য প্রকরণ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪০৬

৫। চৌধুরী প্রমথ, 'প্রবন্ধ সংগ্রহ', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০০০

৬। চট্টোপাধ্যায় কুন্তল, 'সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', রত্নাবলী, কলকাতা, পঞ্চম পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ২০১২

৭। জানা ভানুভূষণ, 'রোম্যান্টিকতা ও বাঙলা কাব্যে রোম্যান্টিক ধারার বিবর্তন', কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীপঞ্চমী ১৩৯৩

৮। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'ছিন্নপত্রাবলী', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, নতুন সংস্করণ, চৈত্র ১৩৯৯

৯। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'ছেলেবেলা', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪০৫

১০। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৭৫

১১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'প্রাচীন সাহিত্য', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, কার্ত্তিক ১৪০৭

১২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'বিচিত্র প্রবন্ধ', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৫৫

১৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সঞ্চয়িতা', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৭৯

১৪। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৭৫

১৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের পথে', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৭৫

১৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সোনারতরী', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৮৪

১৭। দে অধীর, 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা' (দ্বিতীয় খণ্ড), উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৯৮

১৮। দে বিশ্বনাথ (সম্পা.), 'রবীন্দ্র স্মৃতি', ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮

১৯। দাশগুপ্ত সুরেন্দ্রনাথ, 'সৌন্দর্যতত্ত্ব', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ পৌষ ১৪১৫।

২০। দাস রঞ্জনকুমার (সম্পা.), 'শনিবারের চিঠি' (প্রবন্ধ সংকলন), নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭

২১। দেব চিত্রা, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২৫ শে বৈশাখ ১৩৮৭

২২। বসু অনিলচন্দ্র (সম্পা.), 'কাব্যালংকারসূত্রপ্রবৃত্তিঃ', সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩

২৩। বসু শুদ্ধসত্ত্ব, 'বাংলা সাহিত্যের নানারূপ', বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ২১ শে মাঘ, ১৪০১

২৪। বাগচী শর্মিলা, 'প্রসঙ্গ : রম্যরচনা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৭

২৫। বিশ্বাস অচিন্ত্য, 'কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ রাখী পূর্ণিমা ১৪০৭

২৬। ভট্টাচার্য পরেশচন্দ্র, 'সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়' (আধুনিকযুগ), জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৯৪

২৭। মজুমদার উজ্জ্বলকুমার, 'সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি', দে'জ পাবিলিশিং,

কলকাতা, জানুয়ারী ২০০৩।

২৮। মুখোপাধ্যায় ড. দুর্গাশঙ্কর, 'সাহিত্য তত্ত্বের কথা', মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মহালয়া ১৩৯৫

২৯। মুখোপাধ্যায় ড. বিমলকুমার, 'রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯

৩০। মুখোপাধ্যায় ড. বিমলকুমার, 'সাহিত্য বিবেক', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪

৩১। রায় অপূর্বকুমার, 'শৈলী বিজ্ঞান', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯৮৯

৩২। রায় অপূর্বকুমার, 'সাহিত্য : রূপ-বিচিত্রা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০৮

৩৩। সেন সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৫ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৫

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

বলেন্দ্রনাথের রচনার তালিকা

১। চিত্র ও কাব্য (প্রবন্ধ) ২০ আগস্ট, ১৮৯৪ খ্রীঃ

২। মাধবিকা (কাব্য) ২১ এপ্রিল, ১৮৯৬ খ্রীঃ

৩। শ্রাবণী (কাব্য) ১৭ জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ

ক) 'চিত্র ও কাব্য'-র প্রবন্ধ সমূহ:

১। কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা সাধনা ভাদ্র-আশ্বিন, ১২৯৯

২। উত্তরচরিত, ঐ, আষাঢ়, ১৩০০

৩। মৃচ্ছকটিক, ঐ, মাঘ, ১৩০০

৪। জয়দেব, ঐ, ফাল্গুন, ১৩০০

৫। পশুপ্রীতি, ঐ, চৈত্র, ১৩০০

৬। কাব্যে প্রকৃতি, ঐ, বৈশাখ ১৩০১

৭। রবিবর্মা, ঐ, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০

৮। হিন্দু দেবদেবীর চিত্র, ঐ, মাঘ ১৩০০

খ)'মাধবিকা'র কবিতাসমূহ:

১।মাধবিকা ২। আশঙ্কা ৩। মূঢ়তা ৪। অকলঙ্ক ৫। অগ্নিহোত্র ৬। অন্ধের যষ্টি ৭। উপমা ৮। দুর্নিমিত্ত ৯। শিঞ্জন ১০। সমস্যা ১১। কলবেদনা ১২। কর্ণধার ১৩। বৃথাগর্ব ১৪। পরীক্ষা ১৫। সফলতা ১৬। বিষামৃত ১৭। কুম্ভমেলা ১৮। পরিণাম ১৯। সর্বস্বান্ত ২০। ভীমরতি ৩। ভিক্ষা ২২। দোষ ২৩। মান ২৪। বিড়ম্বনা ২৫। অবসান।

গ)'শ্রাবণী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাবলী:

১।চিরনব ২। অন্তরবাসিনী ৩। স্নানযাত্রা ৪। আবাহন ৫। অপরাহ্নে ৬। দিনযাপন ৭। উৎসব ৮। মেঘদূত ৯। পথে পথে ১০। কোথা ১১। বিরহের মিলন ১২। সুনিপুনা ১৩। গৃহলক্ষ্মী ১৪। বধূ ১৫। বারুণী ১৬। দ্বিধা ১৭। দোঁহে ১৮। কলসীর সুখ ১৯। দুর্বিপাক ২০। মুকুরমায়া ২১। চুলবাঁধা ২২। সন্তরণ ২৩। শ্রাবণী ২৪। অসমাপ্ত

সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে প্রকাশিত কিছু কবিতা গান—

শিরোনাম	সাময়িকপত্র	প্রকাশকাল
১। সন্ধ্যা	বালক	ফাল্গুন ১২৯২
২। অশ্রুজল	ভারতী ও বালক	কার্ত্তিক ১২৯৩
৩। অবসান	ভারতী ও বালক	জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪
৪। হাসি	ঐ	বৈশাখ ১২৯৬
৫। হিমে	ঐ	বৈশাখ ১২৯৬
৬। বিদেশের ঝরাফুল	ঐ	অগ্রহায়ণ ১২৯৭
৭। কল্লোলিনী	ঐ	জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭
৮। বিজ্ঞতা	সাহিত্য	আষাঢ় ১২৯৭
৯। সৌরভ	বিশ্বভারতী পত্রিকা	বৈশাখ আষাঢ় ১২৫৩
১০। দুজনায়	ঐ	,, ১২৫৩
১১। বিদায়	ঐ	,, ১২৫৩

এছাড়াও দুটি ব্রহ্মসঙ্গীত প্রকাশিত হয়েছিল।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহ :

প্রবন্ধের শিরোনাম	সাময়িক পত্র	প্রকাশকাল
একরাত্রি	বালক	জ্যৈষ্ঠ ১২৯২
চন্দ্রপুরের হাট	বালক	শ্রাবণ ১২৯২
বনপ্রান্ত	বালক	আশ্বিন-কার্ত্তিক ১২৯২
পুলের ধারে	বালক	ফাল্গুন ১২৯২
মিলন	ভারতী ও বালক	বৈশাখ ১২৯৩
সন্ধ্যা	ঐ	আষাঢ় ১২৯৩
ঊষা ও সন্ধ্যা	ঐ	ভাদ্র ১২৯৩
যাত্রা	ঐ	পৌষ ১২৯৩
কাহিনী	ঐ	ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩-১২৯৪
আশা	ঐ	আষাঢ় ১২৯৪

প্রণাম	ঐ	শ্রাবণ ১২৯৪
বন্দিনী	ঐ	ভাদ্র ১২৯৪
হৃদয়াঞ্জলি	ঐ	কার্ত্তিক ১২৯৪
দু'জনায়	ঐ	অগ্রহায়ণ ১২৯৪
বিরহ	ঐ	চৈত্র ১২৯৪
বসন্তের কবিতা	ঐ	জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫
আষাঢ়ে গল্প	ঐ	আষাঢ় ১২৯৫
আষাঢ়ে ও শ্রাবণ	ঐ	শ্রাবণ ১২৯৫
অতীত	ঐ	ভাদ্র ১২৯৫
জন্মভূমি	ভারতী ও বালক	অগ্রহায়ণ ১২৯৫
ভূতকথা	ঐ	পৌষ ১২৯৫
কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী	ঐ	ফাল্গুন ১২৯৫
রঙ্ ও ভাব	ঐ	চৈত্র ১২৯৫
গোধূলি ও সন্ধ্যা	ঐ	চৈত্র ১২৯৫
অতির গতি	ঐ	চৈত্র ১২৯৫
মেঘদূত	ঐ	জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য	ঐ	আষাঢ় ১২৯৬
অশ্রুজল	ঐ	শ্রাবণ ১২৯৬
শ্রাবণের বারিধারা	ঐ	শ্রাবণ ১২৯৬
বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস	ঐ	ভাদ্র ১২৯৬
জীবন ট্র্যাজেডি	ঐ	ভাদ্র ১২৯৬
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	ঐ	ভাদ্র ১২৯৬
ভাদ্রমাসের ভরাগঙ্গা	ঐ	ভাদ্র ১২৯৬
অন্তরঙ্গ-তত্ত্ব	ঐ	আশ্বিন ১২৯৬
মহত্ত্ব	ঐ	আশ্বিন ১২৯৬
বিবিধ প্রবন্ধ	ঐ	কার্ত্তিক ১২৯৬
স্মৃতি ও কবিতা	ঐ	কার্ত্তিক ১২৯৬

সন্ধ্যা	ঐ	কার্ত্তিক ১২৯৬
কৃত্তিবাস ও কাশীদাস	ঐ	কার্ত্তিক ১২৯৬
স্বভাব ও সাহিত্য	ঐ	অগ্রহায়ণ ১২৯৬
মত্ততাসুখ	ঐ	অগ্রহায়ণ ১২৯৬
বঙ্গসাহিত্য: রামপ্রসাদের গান	ঐ	অগ্রহায়ণ ১২৯৬
রমলা	ঐ	পৌষ ১২৯৬
নগ্নতার সৌন্দর্য	ঐ	পৌষ ১২৯৬
রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর	ঐ	পৌষ ১২৯৬
সে	ঐ	মাঘ ১২৯৬
ভারতচন্দ্র রায়	ঐ	ফাল্গুন ১২৯৬
ক্ষণিক শূণ্যতা	ঐ	ফাল্গুন ১২৯৬
কেতকা-ক্ষেমানন্দ	ভারতী ও বালক	ফাল্গুন ১২৯৬
প্রেম: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	ঐ	চৈত্র ১২৯৬ ও আষাঢ় ১২৯৭
স্ত্রী ও পুরুষ	ঐ	বৈশাখ ১২৯৭
সূর্য্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়	ঐ	আষাঢ় ১২৯৭
রাধা	ঐ	শ্রাবণ ১২৯৭
দুষ্মন্ত	ঐ	আশ্বিন ১২৯৭
যশোদা	ঐ	অগ্রহায়ণ ১২৯৭
কৈফিয়ৎ	ঐ	অগ্রহায়ণ ১২৯৭
শরৎ ও বসন্ত	ঐ	পৌষ ১২৯৭
বোল্‌তা	ঐ	চৈত্র ১২৯৭
সখ্য	ঐ	চৈত্র ১২৯৭
বোল্‌তা ও মধ্যাহ্ন	ঐ	বৈশাখ ১২৯৭
শিব	ঐ	জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮
কবি ও সেন্টিমেন্ট্যাল	সাহিত্য	জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮
প্রাক্‌টিক্যাল	সাহিত্য	ভাদ্র ১২৯৮
লণ্ডলে কংগ্রেস	ভারতী ও বালক	ভাদ্র ১২৯৮

ঋতুসংহার	সাধনা	অগ্রহায়ণ ১২৯৮
জানালার ধারে	ঐ	অগ্রহায়ণ ১২৯৮
বুদ্ধদেব	ঐ	পৌষ ১২৯৮
রত্নাবলী	ঐ	পৌষ ১২৯৮
দেয়ালের ছবি	ঐ	পৌষ ১২৯৮
মুসলমান দিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ	ঐ	মাঘ ১২৯৮
মালবিকাগ্নি মিত্র	ঐ	মাঘ ১২৯৮
পুরাতন চিঠি	ঐ	ফাল্গুন ১২৯৮
নীতিগ্রন্থ	সাধনা	ফাল্গুন ১২৯৮
তখনকার কথা	সাধনা	চৈত্র ১২৯৮
অভিব্যক্তির নূতন অঙ্গ	ঐ	চৈত্র ১২৯৮
অভিব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর	ঐ	বৈশাখ ১২৯৯
সাময়িক সারসংগ্রহ	ঐ	বৈশাখ ১২৯৯
ধর্ম্মজঙ্গল	ঐ	আষাঢ় ১২৯৯
সাময়িক সারসংগ্রহ	ঐ	অগ্রহায়ণ ১২৯৯
বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা	ঐ	শ্রাবণ ১২৯৯
সাময়িক সারসংগ্রহ	ঐ	অগ্রহায়ণ ১২৯৯
মুসলমান সমাজ	ঐ	মাঘ ১২৯৯
ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম	ঐ	ফাল্গুন ১২৯৯
অনার্য ব্রাহ্মণ	ঐ	ফাল্গুন ১২৯৯
ইংরাজী বনাম বাঙ্গলা	ঐ	চৈত্র ১২৯৯
উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র	ঐ	বৈশাখ ১৩০০
সাময়িক সারসংগ্রহ	ঐ	বৈশাখ ১৩০০
খন্ডগিরি	ঐ	জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
সাময়িক সারসংগ্রহ	ঐ	জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
বিক্রমাদিত্য	ঐ	আষাঢ় ১৩০০
লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ও আহার্য্য সংস্থান	ঐ	শ্রাবণ ১৩০০
বম্মার ডাকাত	ঐ	শ্রাবণ ১৩০০

কণারক	ঐ	ভাদ্র ১৩০০
প্রাচীন উড়িষ্যা	সাধনা	আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০০
বারাণসী	ঐ	পৌষ ১৩০০
বোম্বায়ের রাজপথ	ঐ	অগ্রহায়ণ ১৩০১
গুজরাটে গরবা	ঐ	জ্যৈষ্ঠ ১৩০২
কামবেদনা	ভারতী	বৈশাখ ১৩০৩
দিল্লীর চিত্রশালিকা	ঐ	বৈশাখ ১৩০৫
বেনোজল	ঐ	জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
প্রাচ্য প্রসাধনকলা	ঐ	ভাদ্র ১৩০৫
শুভ উৎসব	ঐ	অগ্রহায়ণ ১৩০৫
গৃহকোণ	ঐ	মাঘ ১৩০৫
নিমন্ত্রণ সভা	ঐ	ফাল্গুন ১৩০৫
রবিবর্মা (অসমাপ্ত)	প্রদীপ	আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩০৬
লাহোরের বর্ণনা (ঐ)	ঐ	ঐ
শিবসুন্দর	ঐ	ঐ
প্রার্থনা	পুণ্য	অগ্রহায়ণ ১৩০৭
গান	,,	পৌষ ১৩০৭
টা ও খান	,,	চৈত্র ১৩০৭
সুরাদেবী	,,	বৈশাখ ১৩০৮
নীরবে	সাহিত্য	আষাঢ় ১৩২৩